মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম

পিনাকী ভট্টাচার্য

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দেশে একটা বয়ান হাজির আছে। সেই বয়ানে ইসলাম অনুপস্থিত। আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করানো হয়েছে, ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। এভাবেই তৈরি হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যের নির্মাণ।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমরা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তারা ইসলামের নাম নিয়ে গণহত্যা জায়েজ করতে চেয়েছে। আবার সেই সময়ের কয়েকটি ইসলামপন্থি দল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থান নেওয়ার ফলে বাম ও সেক্যুলারপন্থিরা মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের প্রশ্নে বুর্জোয়া ফয়সালা হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের নির্মাণ ও পরিচালনায় ইসলাম ছিল প্রাধান্য বিস্তারকারী বয়ান। মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র 'আল্লাহর পথে জেহাদ' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মাঠের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা ছিল ইসলাম; তারা শক্তি নিয়েছে ইসলামের ন্যারেটিভ থেকে। স্বাধীন বাংলা সরকারের বক্তব্য-বিবৃতিতে ইসলাম খুব সাবলীলভাবে বর্তমান ছিল। আলেমসমাজের বড়ো একটা অংশ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশ-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রেখেছেন। ইসলাম নিজ পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে কীভাবে এই জনগোষ্ঠীর এক অন্যতম পরিচয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল, সেটা কখনো খতিয়ে দেখা হয়নি। একটা জনগোষ্ঠী চলার পথের লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস, তাৎপর্যকে কীভাবে তার 'পরিচয় বৈশিষ্ট্য' হিসেবে সাথে নিয়ে চলে, সেটাও আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করিনি। ঠিক কীভাবে এই অঞ্চলের মানুষের মননে ও গঠনতন্ত্রে 'ইসলাম' এক বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্যে স্থায়ী আসন নিয়ে নেয়, সেই তালাশ কেউ করেনি।

৭১-এর বাংলাদেশ যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারত, সেটা করতে না দিয়ে ইসলামে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের একটা কৃত্রিম বিরোধ লাগিয়ে রেখেছে সেক্যুলার মহল। *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* সেই কৃত্রিম বিরোধের ধুলোকালি সরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের এক নতুন বয়ান উপহার দেবে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্যুলার বয়ানের কফিনে এই বই হয়ে উঠবে শেষ পেরেক।

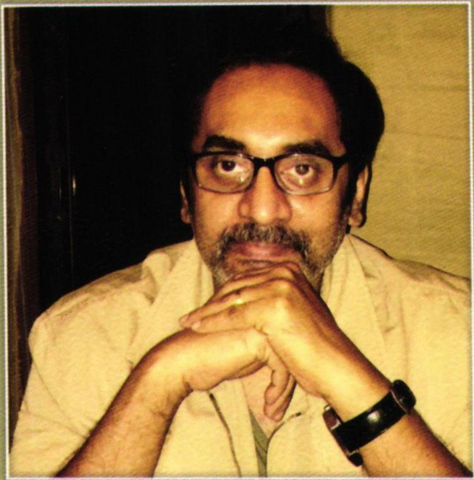

৯০-এর ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের মাঠ থেকে উঠে আসা যে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী সামসময়িক বাংলাদেশ তুমুল আলোচিত হয়েছেন, লেখক হিসেবে পাঠকপ্রিয় হয়েছেন, পিনাকী ভট্টাচার্য তাদের মধ্যে অন্যতম। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে দিশা খুঁজে ফেরা পিনাকী বিচিত্র সব রাজনৈতিক চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। নানাবিধ বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন। মূলত দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতি তাঁর লেখালিখির প্রিয় বিষয়। পেশাদার জীবনে সফল কর্পোরেট চিফ এক্সিকিউটিভ ছিলেন। লেখালিখির পাশাপাশি এখন নিজ ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সময় দিচ্ছেন। 'একাদেমিয়া' নামে একটি নিয়মিত পাঠচক্রের সভাপতি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন জনপ্রিয় ও আলোচিত অ্যাক্টিভিস্ট। ফেসবুকে নিজের সরব উপস্থিতি দিয়ে ইতোমধ্যেই তরুণ প্রজন্মের চিন্তার রাজ্যে ঝড় তুলেছেন। প্রশ্ন তুলতে ভালোবাসেন তিনি। প্রচলিত ধারাবাহিক বয়ানের বিপরীতে তাঁর যৌক্তিক প্রশ্ন নতুন করে ভাবতে শেখায়। স্বপ্ন দেখেন এক ইনসাফপূর্ণ নৈতিক বাংলাদেশের।

www.facebook.com/pinaki.bhattacharya.9

https://www.facebook.com/bloggerpinaki/

www.twitter.com/pinakiTweetsBD

লেখকের কথা

'বয়ান' শব্দ এখানে চিন্তার কন্সট্রাকশন বা চিন্তা-কাঠামো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একেক চিন্তার ফ্রেম বা কাঠামোর কারণে মানুষের একেক ধরনের বয়ান হতে পারে। এই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলামের ভূমিকা কেমন ছিল, তা খুঁজে দেখার সিরিয়াস কাজ হয়নি। বাংলাদেশের সেক্যুলারপন্থিরা একদিকে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার চেতনার কথা বলে ইসলামের বিরোধিতা করে, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেও ইসলামের বিরোধিতা করে। তারা মূলত ইসলাম বিদ্বেষের (Islamophobia) জায়গা থেকে এটা করে থাকে। তারা ইসলাম আর মুক্তিযুদ্ধকে এমন পরস্পর বিরোধীভাবে দাঁড় করায়, যেন একটা থাকলে আর একটা থাকবে না। তাদের সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা মুক্তিযুদ্ধে ইসলাম ও এর অবদান, ব্যবহৃত পরিভাষা এবং নাম-চিহ্নগুলো সব সময় আড়াল করার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের ধুলোকালি সরিয়ে সেই আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া আজকের সময়ের দাবি।

একাত্তরের ১০ এপ্রিল (পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ এপ্রিল) স্বাধীনতার ঘোষণা (Proclamation) করা হয়েছিল। সেখানে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছিল–সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষিত ও লিখিত উদ্দেশ্য ছিল নাগরিক মানুষের এক সাম্য প্রতিষ্ঠা, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম ও চর্চার উপযোগী গণমানুষের রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এটা সেই অর্থে মডার্ন ক্লাসিক্যাল রিপাবলিক ধারণার বাইরের কিছু নয়। রুশো সামাজিক চুক্তিতে যেমন বলেছিলেন–'আমাদের এমন একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব এবং সম্পদকে রক্ষার জন্য সমগ্র সংস্থার শক্তিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে পারি–যাতে আমরা যখন সমগ্রের সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমরা নিজেদের সম্মতিতে নিজেদের ইচ্ছারই মাত্র অনুগত হই এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা ও শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষত থাকে। তার কোনো ক্ষতি ঘটে না।'

https://nagorikpathagar.org

এভাবেই সামাজিক চুক্তি বিকশিত হয়। এ চুক্তি কোনো নিরঙ্কুশ শাসক তৈরি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকারকে সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমষ্টির নিকট সমুদয়ভাবে সমর্পণ করে। মানুষ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। আবার সকল নাগরিক মিলে একটা সার্বভৌম সত্তা হিসেবে রাষ্ট্রের অধীনে নিজেরা কনস্টিটিউট অর্থে গঠিত হয়। প্রত্যেকে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে একটা পলিটিক্যাল কমিউনিটির কাছে; অথচ ব্যক্তিগতভাবে কারও কাছে নত হবে না। ক্ষমতা এখানে ব্যক্তিবিশেষের নয়; পরস্পরের সঙ্গে মিলে তৈরি এক রাজনৈতিক কমিউনিটির। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় গৃহীত রাষ্ট্রগঠনের তিন নীতি বিশ্লেষণ করলে সামাজিক চুক্তির এই বক্তব্যই অনুমোদিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের ভূমিকা কী ছিল, কীভাবে ইসলামের বয়ান মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করেছে, অবদান রেখে সাহায্য করেছে, তা কখনো বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ভূমিকার একটা নিরপেক্ষ পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক সর্বজনগ্রাহ্য দলিলসমূহ থেকেই এখানে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা এবং মাঠের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ইসলাম থেকে তাঁদের লড়াইয়ের বৈধতা খুঁজে নিচ্ছেন এবং নিজেকে উদ্দীপ্ত করছেন।

এই বইয়ে বিভিন্ন দলিলের বরাতে ইসলামের ভূমিকা কী ছিল তার তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট গৌতম দাস পরিপূর্ণ একটা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, ইসলাম প্রসঙ্গে তথ্য-প্রমাণগুলো কেন ইসলামের বাইরের নয়, কেন ইসলামি মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ এবং এর সামাজিক পটভূমি কী ছিল। লেখাটি পরিশিষ্ট হিসেবে বইয়ের শেষে সংযোজন করা হলো। আর খুব অল্প সময়ে মুসতাইন জহির একটি ভূমিকা লিখেছেন। তাঁদের দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে বলতে হবে—এই বিশ্লেষণ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নয়, তবে এ থেকেই আগ্রহী পাঠক যদি মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধিৎসু হন, সেটাই হবে এই বইয়ের সার্থকতা।

পিনাকী ভট্টাচার্য
ঢাকা, অক্টোবর–২০১৭

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম বইটির শিরোনাম থেকেই প্রসঙ্গটা পড়া যাক। লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক বয়ানে ইসলাম প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছেন; শিরোনামে ব্যবহৃত তিনটি শব্দ থেকে এতটুকু খুব সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও জাগছে, সেটা কোন বয়ান? কার বয়ান? আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে প্রচলিত যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা বয়ানের সঙ্গে পরিচিত, তা-ই কি? এখানে প্রশ্নটি আমাদের ভাবনায় একটা যতি চিহ্ন টেনে দেয়। আমাদের থামতে হয়। কারণ, এটাও আন্দাজ করে নেওয়া যাচ্ছে যে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নামক আমাদের 'চেনা-জানা' বয়ানের পুনরাবৃত্তি এই বইয়ের উদ্দেশ্য হওয়ার কথা নয়। ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যেভাবে বিরোধাত্মক বা বিপ্রতীপ সম্পর্কের ছাঁচে ঝালাই করে আস্ত একটা জাদুঘর প্রকল্প খাড়া করা হয়েছে, এই বইটি তাকে আরেক প্রস্থ দীর্ঘতর করার কোনো প্রয়াস নয়; বরং এটা খোদ সেই পাটাতন খুলে দেখানোর চেষ্টা, যার ওপর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ধর্মরিপেক্ষতার আড়ালে ইসলামবিরোধী একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়ান প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদন করা হয়।

এই যে যতি ও বিরতি, থেমে নতুন করে দেখা এবং সেখান থেকে প্রস্থান-রেখা ও সূচনা-বিন্দু নির্ণয় করা, জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে এর একটা নাম আছে। পদ্ধতিগত দিক বিবেচনায় যাকে ছেদটানা (Epistemological break) বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমি নিশ্চিত, *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* বইটি বাংলাদেশে এই ঘটনা ঘটাবে। সেটা কেন দাবি করা যায়, সেই প্রসঙ্গে কয়েকটা নোক্তা দেওয়াই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য।

তাহলে শিরোনাম থেকে যে প্রশ্নটা জেগেছে, তার উত্তর পেতে নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে একটা নতুন বয়ান অনুসন্ধানে নামতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষার ভাষা, যুদ্ধের ন্যায্যতা নির্মাণ ও পরিচালনায় উপাদান ও আশ্রয় হিসেবে ইসলাম কোথায়, কতটুকু উপস্থিত ছিল? তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতটুকু? শুধু ব্যাপকতার নিরিখেই নয়; পাশাপশি ইসলাম এই বয়ান সংগঠনে কতটা নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে, তা স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা থেকে যুদ্ধকালীন দলিল, রাজনৈতিক প্রচার-পুস্তিকা ও ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সুসংহতভাবে দেখানো সম্ভব কি না? আমার মতে, এই বইয়ে লেখক তা বেশ জোরালোভাবেই দেখাতে পেরেছেন বলা যায়। আর তা এমন একটা বিরাট ক্ষেত্র উন্মোচন, যা দেশের জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার বয়ানের অসারতার বাইরে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পুনরায় পাঠ করার নতুন প্যারাডাইম তৈরি করতে সক্ষম।

বলাবাহুল্য, সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী ধারার যে রাজনীতি এখন বহাল আছে, যে বয়ানকে ঘিরে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা দাবি করা হয়, তা খুব দ্রুতই ভেঙে পড়তে বাধ্য। আগেই বলেছি, বইটি একটা ঘটনার জন্ম দেবে। রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে এটা হবে যুগান্তকারী ঘটনা। এতদিন আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী বয়ানের অন্যতম প্রস্তাবনা হিসেবে দেখেছি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের বিরোধিতায় যেহেতু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ও কতিপয় রাজনৈতিক দল ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে, ধর্মের কথা বলে নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছে, সেহেতু মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্ম তথা ইসলামের সংস্রবমুক্ত একটা রিপাবলিক (রাজনৈতিক পরিসর) ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যই হচ্ছে যেন মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা! এতদিন আমরা এর মতাদর্শগত রাজনৈতিক সমস্যার দিকগুলো প্রকাশ্য হতে দেখেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গণ-আকাঙ্ক্ষা এবং সে সময়কার চেতনা থেকে জাত একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের আবশ্যিকতা উত্থাপন করা হয়। জাতীয়তাবাদী এই ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র বিশ্লেষণ বা রাজনৈতিক প্রস্তাবনার বিরোধিতা মাত্রই যেন তা মুক্তিযুদ্ধের মর্ম ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারণ!

অথচ আমরা দেখছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ১৯৭২ সালে সংবিধানে প্রবেশ করার আগে রাজনৈতিক দাবি বা প্রস্তাব আকারে আলোচিত হয়েছে—এমন কোনো নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

https://nagorikpathagar.org

তাহলে স্বভাবতই আমাদের উত্তর পেতে হয়, মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্ক্ষা এবং যুদ্ধ চলাকালীন সেই আকাঙ্ক্ষার পক্ষে ন্যায্যতা তৈরি করতে হয়েছে, তাতে ইসলাম প্রসঙ্গ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলামের অনুপস্থিতি, একে সচেতনভাবে দূরে রাখা কিংবা সরাসরি বিযুক্ত করে জনগণের মধ্যে অন্তত একটা সম্মতি সৃষ্টির প্রয়াস হতে পারে–এর সপক্ষে একমাত্র গ্রাহ্য প্রমাণ। এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার সুরাহা করতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতিগত প্রশ্নটি আগে ফয়সালা করতে হয়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যেসব লেখাপত্র আছে, তা বোধগম্য কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসের দুটি গুরুত্ব উপাদানকে কখনোই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে না। সেই দুটি উপাদান হলো–

এক. পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন নিজেদের দাবি-দাওয়া জনগোষ্ঠীর কাছে যে ভাষায় হাজির করে, তাকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত করেছে, সেই সমস্ত ভাষ্য, কর্মসূচি, প্রচার-পুস্তিকা।

দুই. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে বয়ান ও ভাষ্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে।

পিনাকী ভট্টাচার্য এই দুটি উপাদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তার অনুসন্ধানের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু সে সময়কার বয়ান নয়; ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য উপাদান নির্বাচন ও গৃহীত উপাদানকে যে সম্পর্ক-সূত্র দ্বারা প্রণালিবদ্ধ করতে হয়, সেদিক থেকেও পিনাকী ভট্টাচার্য নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দাবি ও কর্মসূচি, সেই সময়কালে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য, বিশেষত অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ইত্যাদি সূত্রের আন্তঃসম্পর্ক ও প্রস্তাবিত রাজনীতিতে চরিত্রগতভাবে ইসলামের অবস্থান কী ছিল–তা ব্যাখ্যা করেছেন। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ের বিভিন্ন দলিলপত্রকে তাঁর বিশ্লেষণের জন্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যা একই সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধের সূচনার পর নতুন রাষ্ট্রের রূপকল্প ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত প্রেরণা হিসেবে যে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তার সমাহার। পদ্ধতি হিসেবে যে কারও জন্যই এটাই প্রাথমিক এবং স্বাভাবিক হওয়ার কথা। সেটাই বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এতদিন হয়নি।

https://nagorikpathagar.org

এজন্যই আমার দ্বিতীয় দাবি, এটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের বয়ানের নতুন নির্মাণ নয়; একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার ভাষা পাঠ করার একটি নতুন ধারার সূচনা।

কিন্তু এই প্রশ্নও নিশ্চয় অনেক পাঠকের থাকবে, মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম এত প্রবল ও বিপুলভাবে আমাদের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার ভূগোল অধিকার করে থাকার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? তাহলে পাকিস্তান থেকে আমরা রাষ্ট্র হিসেবে কী কারণে আলাদা হলাম? যে রাজনৈতিক পরিচয়কে ভিত্তি ধরে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা যার অংশ ছিলাম, সেখান থেকে নিজেদের আলাদা করে নেওয়ার ও দেখার সঙ্গে ইসলাম প্রশ্নের মোকাবিলা কীভাবে হয়েছে?

এই দিকটার একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম এবং বয়ানের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ভারকেন্দ্র কেন ইসলামকে আশ্রয় করেই আবর্তিত হয়েছে, সেই দিকটার ফয়সালা হবে না। সেই ব্যাখ্যাটি এখানে পাঠক গৌতম দাসের ব্যাখ্যামূলক পরিশিষ্টে সংযুক্ত রচনায় বিস্তারিতভাবে পাবেন। আমরা দেখব, খোদ মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে মূলগতভাবে ইসলামের আদর্শিক পাটাতনে দাঁড়িয়ে, পাকিস্তানি শাসকের বয়ান ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পালটা ইসলামের বয়ান খাড়া করেছে। সেটা শুধু কৌশলগতভাবে পাকিস্তানি শাসকদের চালানো প্রচারণার জবাব দেওয়ার জন্য নয়; বরং এটা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া ছিল অসম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় গঠনের ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে যার কারণ নিহিত।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তো বটেই; বাংলাদেশের রাজনীতির নাড়ির যোগটা যারা ধরতে চাইবেন, আগামী দিনের বাংলাদেশকে পুনর্নির্মাণ বা নতুন রাজনীতির পরিগঠন করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের সকলের জন্য কেন ইসলাম কেন্দ্রীয় বিবেচ্য হিসেবে থেকে যেতে বাধ্য। *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* বইটি সামগ্রিকভাবে তারই স্বাক্ষর বহন করবে।

মুসতাইন জহির
ঢাকা, অক্টোবর-২০১৭

https://nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক দলিলে ইসলাম ১৫

মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণের বয়ান-বক্তৃতায় ইসলাম ২৩

ইসলামি চিহ্ন ও পরিভাষা : স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ২৫

মুক্তিযুদ্ধকালে সরকারি ঘোষণা ও নির্দেশনাবলিতে ইসলাম ২৯

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের বোঝাতে ইসলামের প্রতীক ও চিহ্নের বিকৃত উপস্থাপন ৩৩

রাজাকার ছিল কারা ৪২

মুক্তিযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস খোঁজে : স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির চিঠি ৪৬

মুক্তিযুদ্ধে দেশের আলেম সমাজের ভূমিকা ৫৪

মুক্তিযুদ্ধে উপমহাদেশের আলেম সমাজের ভূমিকা ৫৮

স্বাধীনতাপরবর্তী উপমহাদেশের আলেম সমাজের অবস্থান ও উপলব্ধি ৬৭

মওলানা ভাসানী ও মুক্তিযুদ্ধ ৭০

রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিপত্রে ইসলামি ভাব-প্রভাব ৭৭

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে ইসলাম প্রসঙ্গ ৮৪

মুক্তিযুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকায় ইসলাম প্রসঙ্গ ১০১

উপসংহার ১১৫

পরিশিষ্ট : মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম– প্রসঙ্গ কথা গৌতম দাস ১১৭

গ্রন্থপঞ্জি ১৪২

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

এক

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক দলিলে ইসলাম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলটির নাম নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ। আলোচনার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী দলিল, বক্তব্য ও কর্মসূচিতে ইসলাম ও ইসলামের অনুষঙ্গ কীভাবে ছিল, প্রথমে আমরা তার একটু সন্ধান করব। এখানে সাতটি আলাদা রেফারেন্স তুলে সেই সন্ধানে যাব।

এক.

১৯৬৯ সালে প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধান সংশোধনী বিলে সংবিধানে 'ইসলামি রিপাবলিক অব পাকিস্তান' শিরোনামসহ এর ইসলামি আদর্শ বহাল রাখার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সম্মতি জানিয়েছিল।[১]

দুই.

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাদের কাউন্সিল অধিবেশন ৬ জুন, ১৯৭০-এ যে কর্মসূচি গ্রহণ করে, সে বিষয়ে পরের দিন ৭ জুন *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় একটি রিপোর্ট ছাপা হয়।

---

১. মওদুদ আহমদ, অনুবাদ : জগলুল আলম, *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১২০, ১৬৫

https://nagorikpathagar.org

সেখানে বলা হয়–

'কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে যাতে কোনো আইন পাস না হইতে পারে, তজ্জন্য আওয়ামী লীগ শাসনতান্ত্রিক বিধান রাখার কথাও দলীয় কর্মসূচিতে ঘোষণা করে।

শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হইবে এবং সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে। আইনের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম-মর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হইবে এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে তাদের নিরাপত্তাবিধান করা হইবে। সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ধর্ম আচরণ, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারেও তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।'[২]

তিন.

১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতারে ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে 'লেবেলসর্বস্ব ইসলাম নয়' অংশে তিনি বলেন–

'আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য– লেবেলসর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী, ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসুলে করীম ﷺ-এর ইসলাম; যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন; আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য।'[৩]

---

২. নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৫৫-৫৬

৩. *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ২১

https://nagorikpathagar.org

চার.

'৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের পরে ৩রা জানুয়ারি রমনায় একটি সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধীদের এই ক্ষতিকর প্রচারণা উড়িয়ে দেন যে তার দল মুসলমানের দল নয় এবং আওয়ামী লীগে মুসলমান ঐতিহ্যের চাইতে হিন্দু ঐতিহ্যেকেই ধারণ করে। সমাবেশ কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয় এবং বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান আল্লাহ্‌র ধর্মকে রাজনৈতিক কার্ড হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তিনি উচ্চস্বরে "আসসালামু আলাইকুম" বলে তার বক্তব্য শুরু করেন এবং একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন–"ন্যাশনাল এবং প্রাদেশিক এসেম্বলিতে আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচিত হওয়ার পরেও কোথাও কি ইসলামের চর্চা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে কোনো অভিযোগ এসেছে? মানুষ কি তার নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে চলছে না? ইসলামের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? ইসলাম কি চলে গেছে, এই মহান ধর্মে কি আর কেউ এখন দীক্ষিত হচ্ছে না? শেখ মুজিব বলেন, আমি জানি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য প্রচার চালাতে পূর্ব পাকিস্তানে কত টাকা ঢালা হয়েছে।" সমাবেশে আন্দোলনে নিহতদের মাগফেরাত কামনার জন্য ফাতেহা পাঠ করা হয়। এর মধ্যেই আসরের আযান শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই সভার কাজ মুলতবি রাখার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ নয়; বরং যারা তাঁদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করছে তারাই ইসলামের ক্ষতি করছে। সভা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই "নারায়ে তাকবির" স্লোগান তোলেন।'[৪]

পাঁচ.

৭০-এর নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ মুহূর্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। এর আগে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ স্পষ্টভাবেই ইসলাম প্রশ্নে তাদের অবস্থান ঘোষণা করেছিল এভাবে–

> '৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থি হতে পারে না। আমরা এই

[৪]. দ্যা পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, জানুয়ারি ৪, ১৯৭১

https://nagorikpathagar.org

শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামি নীতির পরিপন্থি কোনো আইনই এ দেশে পাস হতে বা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।'[৫]

ছয়.

পাকিস্তানি শাসকেরা ২৫ মার্চের পরে গণহত্যা চালিয়েছে। আর তাদের সেই ঘৃণ্য কাজের পক্ষে সাফাই হিসেবে কখনো তা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য, আবার কখনো তা ইসলামকে রক্ষার জন্য করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সব সময়ই ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণের নামে করা এই কাজকে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি হিসেবে দেখেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের বক্তব্যে বারবার প্রসঙ্গটি এনে জনগণকে সতর্ক করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সে কথা উল্লেখ করেছেন ঠিক এভাবে–

'জনগণকে ইসলাম ও মুসলমানের নামে স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্ম ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধ করতে তারা দেবে না।'[৬]

সাত.

যে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগের গড়ে উঠার সকল পর্যায়ে ইসলাম সব সময়েই তার বয়ানে প্রধান উপাদান হিসেবে ছিল। যেমন :

ক. আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা হয় যে সম্মেলনে, সেই সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক 'মূল দাবি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা পাঠ করেন। এই পুস্তিকায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়–

'রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভূ হিসেবে জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গঠনতন্ত্র হবে নীতিতে ইসলামি, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।'[৭]

---

৫. নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৬৫

৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা : ২৫৮

৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা : ২৬২

https://nagorikpathagar.org

তাদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের ১ নং ধারায় 'দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শক্তিশালী করার' কথা বলা হয়। গঠনতন্ত্রের ১০ নং ধারায় বলা হয়–

> 'To disseminate true knowledge of Islam and its high morals and religious principles among the people.
>
> অর্থাৎ জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান, তার উচ্চ-নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় নীতিমালার বিস্তার করা।'[৮]

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট (যার প্রধান শরিক দল ছিল আওয়ামী লীগ এবং অন্যতম শরিক দল ছিল নেজামে ইসলাম পার্টি) মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় :

> 'কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হবে।'[৯]

গ. ১৯৫৫ সালের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পক্ষ থেকে যে সাংগঠনিক প্রচারপত্র বের হয়, তার ১৭ ও ১৮ নং দাবি ছিল এ রকম :

(১৭) 'মদ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।

(১৮) মুসলমানগণ যাহাতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কাজে অবহেলা না করেন এবং সকল শ্রেণির নাগরিকগণের চরিত্র গঠনের জন্য প্রচার (তাবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।'[১০]

---

৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা : ১২১

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৩৭০

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৪১৮-৪২০

https://nagorikpathagar.org

ঘ. ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা পেশ করেন। পরবর্তীকালে এই ৬ দফাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন হিসেবে পরিণতি লাভ করে। সেই ৬ দফা ছিল মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি। এতে কোনো 'ধর্মনিরপেক্ষতার' কথা ছিল না; বরং প্রথম দফা ছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

ঙ. ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলনে ছাত্রসমাজের ১১ দফা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত ১১ দফায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও 'ধর্মনিরপেক্ষতার' কথা কোথাও দাবি করা হয়নি।

চ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, 'কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না।' নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পর তাদের সংবিধান কমিটি (ড. কামাল হোসেন যার চেয়ারম্যান ছিলেন) কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় তদানীন্তন পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল।[১১]

ছ. ৭০-এর নির্বাচনের পর সংবিধান কমিটি প্রণীত সেই খসড়া সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি (Directive principles of state policy) হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছিল :

(১) কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করা হবে না।

(২) কুরআন ও ইসলামিয়াত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

(৩) মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি নৈতিকতা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।[১২]

---

১১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, সংযোজন ১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৭৯৩ (ইংরেজি থেকে অনূদিত)

১২. *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৯৪ (ইংরেজি থেকে অনূদিত)

https://nagorikpathagar.org

জ. সম্প্রতি প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমানের রচনাসংগ্রহেও ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তাঁর মতামত পাওয়া যাচ্ছে–

(১) 'জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম। আওয়ামী লীগ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট গ্যারান্টি থাকবে যে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহতে সন্নিবেশিত ইসলামের নির্দেশনাবলির পরিপন্থি কোনো আইন পাকিস্তানে প্রণয়ন বা বলবৎ করা চলবে না। শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি সন্নিবেশিত হবে। সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২) সংখ্যালঘুরা আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমান অধিকার ভোগ করবে। নিজেদের ধর্ম পালন ও প্রচার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় এবং নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের অধিকার শাসনতান্ত্রিকভাবে রক্ষা করা হবে।

স্বীয় ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম প্রচারের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা হবে না। নিজ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম সম্পর্কীয় কোনো নির্দেশ গ্রহণ অথবা কোনো ধর্মীয় উপাসনা বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে জোর করা হবে না।'[১৩]

তাহলে স্পষ্ট যে, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্ম থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জনগণের সামনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কোনো প্রস্তাব বা কর্মসূচি কখনো কোথাও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়নি;

---

[১৩]. শেখ মুজিবুর রহমান, *মুজিবুরের রচনা সংগ্রহ*, বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম, ঢাকা, ২০১০, পৃ : ১৬২

https://nagorikpathagar.org

বরং বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষায় জনগণকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কুশাসন ও আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন কখনোই ইসলামবিরোধী আন্দোলন নয়; বরং তারা ক্ষমতায় গেলে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন পাস করবে না। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকেও গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টকে এবং ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগকে জনগণ ভোট দিয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আশায়, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রত্যাশায়। কোনো বিবেচনায়ই জনগণ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে ভোট চাওয়াও হয়নি; বরং ইসলাম সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ভূমিকা রাখবে—এমন কথাই বলা হয়েছিল।

কাজেই আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়াস। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা অথবা আওয়ামী লীগের ৬ দফায় আর যা কিছুই থাকুক, সেসব কিছুর বয়ানে ইসলাম এক মুখ্য ও জরুরি ভিত্তি হিসেবে থেকেছে। যত জায়গায় আওয়ামী লীগের কাম্য রাষ্ট্রের কল্পনা করে কোনো কথা লেখা হয়েছে, তার কোথাও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য 'ধর্মনিরপেক্ষ' হবে—এমনটা পাওয়া যায় না। এমনকী এই শব্দের অর্থ দিয়ে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, এমনটাও পাওয়া যায় না।

https://nagorikpathagar.org

দুই

মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণের বয়ান-বক্তৃতায় ইসলাম

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব **ইনশাআল্লাহ**।'

আবার ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি যে বেতার ভাষণ দিয়ে বিজয় ঘোষণা করেন, সেখানে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন এই বলে—

> 'আমি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব দেশবাসীকে **আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া** জ্ঞাপনের জন্য ও একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে **আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশ কামনা** করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।'[১৪]

'ইনশাআল্লাহ' বলে যে মুক্তিযুদ্ধের শুরু এবং **'আল্লাহর সাহায্য কামনা করে'** আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ, সেই মুক্তিযুদ্ধকে পরবর্তী সময়ে প্রকারান্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেহেতু পাকিস্তানের অখণ্ডতা আর ইসলামকে সমার্থক করে তুলেছিল এবং নির্মম গণহত্যাকে ইসলামের নামে জায়েজ করতে চেয়েছিল,

---

১৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৩১৪

https://nagorikpathagar.org

সে কারণেই ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুক্তিযুদ্ধ আর ইসলামকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছে। ১৯৭১-এ ইসলামপন্থি মুখ্য দল ছিল তিনটি– জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলাম সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। তবে নেজামে ইসলাম দলটি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল ছিল এবং মাঠে-ময়দানে ততটা সক্রিয় ছিল না। অন্যদিকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাই এই দলের সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া দল থেকে পদত্যাগ করে পশ্চিমাদের সহযোগী হন।[১৫]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে বাংলাদেশের আলেমগণ সবাই একমত ছিলেন। সেই সময়ে সমগ্র আলেম সমাজের মাত্র ১০% আলেম রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ও রাজনীতির খোঁজখবর রাখতেন।[১৬]

কওমি ধারার তৎকালীন অরাজনৈতিক অংশটি সম্পর্কে বলতে হয়, তারা সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও রাজনীতি সম্পর্কে একেবারে উদাসীনও ছিলেন না। ভারতে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের কারণে তারা ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে ব্যথিত ছিলেন; যদিও পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন না। তাই মুক্তিযুদ্ধকালে এদের নিষ্ক্রিয় নৈতিক সহানুভূতির পাল্লা কিছুটা হলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। বেগম জিয়ার পূর্ববর্তী শাসনামলের শেষ দিকে শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের ওপর হামলা হলে তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি এর নিন্দায় প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের আলেম' বলে অভিহিত করেছিলেন।[১৭]

---

১৫. শাকের হোসাইন শিবলি, *একাত্তরের চেপে রাখা ইতিহাস: আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে*, আল-এছহাক প্রকাশনী, ২০১৪, ভূমিকা 'সাহসের সমাচার'।

১৬. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০০৭, পৃষ্ঠা : ২৪

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৫৫

https://nagorikpathagar.org

তিন

ইসলামি চিহ্ন ও পরিভাষা : স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিলগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব–মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা (Source of all justification) আমরা খুঁজেছি ধর্মের মধ্যে; বিশেষত ইসলামের মধ্যে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায়যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলামের রেটরিক বা বয়ান। মুক্তিযোদ্ধারাও যোগাযোগের সময়ে বা চিঠিপত্রে ব্যবহার করছে তাঁর যাপিত ইসলামি জীবনের নানা কথা।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার বিষয়ে প্রথম খবর জানা যায় ১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় এবং এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী রাষ্ট্র ভারতের সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক রক্ষায় এই সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

https://nagorikpathagar.org

এই সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রবল যুদ্ধে রূপ নেয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হতে থাকে।

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' একটি অস্থায়ী বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর এর নাম বদলে 'বাংলাদেশ বেতার' করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা থেকে সম্প্রচার শুরু করে বাংলাদেশ বেতার, যা 'রেডিও পাকিস্তান'-এর ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনোবলকে উদ্দীপ্ত করতে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রতিদিন মানুষ অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অপেক্ষা করত। 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি এ বেতার কেন্দ্রের সূচনা সংগীত হিসেবে প্রচারিত হতো।[১৮]

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শুরু বলা যেতে পারে। সে সময়ে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র আগ্রাবাদে অবস্থিত বেতার ভবন ও কালুরঘাট ট্রান্সমিটার–এ দুটির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আগ্রাবাদ বেতার ভবন থেকে অনুষ্ঠানগুলো টেলিফোন লাইন, এফএম ট্রান্সমিটার অথবা এক্সটিএলের মাধ্যমে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে পাঠানো হতো। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার তা গ্রহণ করে ৩৪৪.৮ মিটার বা ৮৭০ কিলোহার্জে প্রচার করত। কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে একটি ছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমার্জেন্সি স্টুডিও ছিল। চট্টগ্রাম বেতারের প্রচারক্ষমতা ছিল ১০ কিলোওয়াট, ইমার্জেন্সি স্টুডিও ব্যবহারের সময়ও ওই ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাই ব্যবহৃত হতো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারক্ষমতাও ছিল ১০ কিলোওয়াট। কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রটির অবস্থান চান্দগাঁও এলাকায়, বর্তমানে বহদ্দারহাট বাস টার্মিনালের উত্তর পাশে অবস্থিত।

২৬ মার্চে এই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ২৬ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই কেন্দ্র মোট ১৩টি অধিবেশন সম্প্রচার করে বলে জানা যায়।

---

১৮. মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ৩য় সংস্করণ, সিটি পাবলিশিং হাউস লি., ঢাকা, '৯৭, পৃষ্ঠা : ৭৩

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধিবেশনে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি'–এ বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় অধিবেশন। কবি আবদুস সালাম কর্তৃক **কুরআন তিলাওয়াতের** মাধ্যমে শুরু হয় মূল অধিবেশন। এরপর ডাক্তার আনোয়ার আলীর কাছ থেকে পাওয়া বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত 'জরুরি ঘোষণা' শীর্ষক স্বাধীনতার ঘোষণা-সম্পর্কিত প্রচারপত্রটি বিভিন্ন কণ্ঠে বারবার প্রচারিত হয়। বহির্বিশ্বের সাহায্য কামনায় ইংরেজিতে নিউজ বুলেটিনে কণ্ঠ দেন বেতারের প্রযোজক আবদুল্লাহ আল ফারুক। কবি আবদুস সালাম স্বাধীনতার পক্ষে ও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার সর্বস্তরের জনগণকে যার হাতে যা আছে তা নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।[১৯]

কবি আবদুস সালামের এই ঘোষণাকে বলা যেতে পারে, ২৬ মার্চের পালটা যুদ্ধ ঘোষণার পর বেতারের প্রথম বেসামরিক ঘোষণা। কী বলেছিলেন তিনি সেই ঘোষণাতে? আসুন, সেই ঘোষণা পড়তে শুরু করি–

'নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লীয়ালা রাসুলিহীল কারিম

আসসালামু আলাইকুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে **ইসলাম** ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এ গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে **জান-মাল কোরবানি দিচ্ছি, কোরআনে করিমের ঘোষণা- তারা মৃত নহে, অমর।**

দেশবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি।

---

১৯. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, 'কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা', *প্রথম আলো*, ২৬শে মার্চ ২০১২

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহর ফজল করমে বাংলার আপামর নর-নারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি- তাঁদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমনকি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণকামড় দিয়েছে। তারা এ সোনার বাংলাকে সহজে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোনো অবাঙালি সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না। মরণ তো মানুষের একবার। বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মতো মরতে জানে না। **মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজী।**

কোনো গুজবে কান দেবেন না। খালি হাতে কয়েকজন মিলে কোনো পশ্চিমা মিলিটারির মোকাবিলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই শক্তি জুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে- তা হতে পারে না। দশজনে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল, বাজি প্রস্তুতকারীরা মরিচের গুঁড়ার ঠোঙা বানিয়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলি বাতির বাল্বে এসিড ভরে তাও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।'[২০]

'নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব। আল্লাহর সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী।'

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কলকাতা বেতার স্টেশন থেকে বিশ্ববাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তব্য প্রচার করা হয়। তাতে আমরা দেখি সর্বশেষে বঙ্গবন্ধু বলেন :

'May **Allah bless you** and help in your struggle for freedom. JOY BANGLA.'

অর্থাৎ 'এ মুক্তিসংগ্রামে **আল্লাহ্ তোমাদের ওপর রহমত করুন এবং সাহায্য করুন**। জয় বাংলা।' [২১]

---

২০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ১১

২১. *প্রাগুক্ত*, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৩২

https://nagorikpathagar.org

চার

মুক্তিযুদ্ধকালে সরকারি ঘোষণা ও নির্দেশনাবলিতে ইসলাম

'স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনাবলি' শিরোনামে ১৪ এপ্রিল যা প্রচারিত হয়, তার শুরু হয় **'আল্লাহু আকবার'** বলে, আর শেষ হয়–'অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর। বিশ্বাস রাখুন– **"আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী"** বলে।'

সেই সরকারি ঘোষণায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে বলা হয়–

> 'বাঙালির অপরাধ তারা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্তানিদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার দাবি জানিয়েছে। বাঙালির অপরাধ **আল্লাহর সৃষ্ট** পৃথিবীতে, **আল্লাহর নির্দেশমতো** সম্মানের সঙ্গে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ **মহান স্রষ্টার** নির্দেশমতো অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংকল্প ঘোষণা করেছে। ... **আমাদের সহায় পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য।** মনে রাখবেন, আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার দুশমন বাঙালি মুসলমান নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা কাউকে হত্যা করতে, বাড়িঘর লুট করতে, জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। **মসজিদের মিনারে আজান প্রদানকারী মুয়াজ্জেন, মসজিদে-গৃহে নামাযরত মুসল্লি, দরগাহ-মাজারে**

https://nagorikpathagar.org

> **আশ্রয়প্রার্থী হানাদারদের গুলি থেকে বাঁচেনি**। এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। **সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন**। "অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর"। বিশ্বাস রাখুন: **"আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী"**।
>
> জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব! জয় বাংলা!'[২২]

এটি ছিল প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম নির্দেশনামা। অর্থাৎ এটি শুরু হয়েছে **'আল্লাহু আকবার'** দিয়ে এবং শেষ হয়েছে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত দিয়ে। এতে রয়েছে **'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের'** কথা, এতে রয়েছে **'আল্লাহর নির্দেশমতো'** সম্মানের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতনমুক্ত সুন্দর সমাজে বাস করার কথা। এ নির্দেশনামা বিশ্লেষণ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা তো নয়ই; বরং ধর্মের প্রতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের বিষয়টিই স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনা বলে স্বীকৃত হয়।

অর্থাৎ যা আমাদের সকলকে একত্রিত করবে, তেমন এক স্পিরিচুয়াল শক্তি খোঁজার আগ্রহ আর তাগিদই লক্ষ করা যায় সবখানে। মনে রাখা দরকার, এ নির্দেশটি কোনো সরকারি গোপন দলিল ছিল না, এটি পররাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত কূটনৈতিক সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তি ছিল না, এটি ছিল দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত অস্থায়ী সরকারের নির্দেশাবলি। এটি করা হয়েছে দেশের জনগণের চিন্তা, তার যাপিত জীবন, তার মনোভাব ও ধ্যানধারণাকে বিবেচনা করে। এতেই ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের গণমুখী, গণগ্রাহ্য ও গণসম্পৃক্ত চেতনা। এ চেতনা নিয়েই জনগণ মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছিল। **'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা' ও 'কোরআনের বাণী'**–এই ছিল সেদিনকার মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মর্মকথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শিক চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও ভাবাদর্শ। জনগণকে এ কথাই বলা হয়েছিল, জনগণ এ কথার ভিত্তিতেই মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। এই ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে ছিল যুদ্ধে আমাদের স্পিরিচুয়াল গাইড।

এক: আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবিদারেরা নানা কায়দায় মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। মূলত এর মাধ্যমে তারা আসলে

---

২২. *প্রাগুক্ত*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬-১৮

https://nagorikpathagar.org

একাত্তরের পাকিস্তানি শত্রুদের ভাবধারাই ধারণ করছেন। কারণ, এই কাজটিই পাকিস্তানি শত্রুরা তখন করেছিল। আর ফ্রন্টের অসম সাহসী কমান্ডো মেজর এম এ মঞ্জুর তখন **'খোদার ওপর বিশ্বাস রেখে'** মরণপণ সংগ্রাম অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিজ্ঞা করছিলেন।

'গেরিলা ম্যানুয়েল

বাংলার মুক্তিযুদ্ধ

(গেরিলা বাহিনীর নির্দেশাবলি)

"এবারের সংগ্রাম : মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

আমরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী

আমাদের কাম্য : বাংলাদেশের স্বাধীনতা

আমাদের পণ : **খোদার ওপর বিশ্বাস রেখে** মরণপণ সংগ্রাম অক্ষুণ্ন রাখব, যতক্ষণ না আমাদের শেষ শত্রুটিকে দেশছাড়া করব এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব। ...'[২৩]

দুই : সামরিক কোম্পানির ধর্মীয় কর্মাদির নিয়মকানুন

Religious function in Company (Coys)

এখানে গায়েবানা জানাজা, কুরআন পাঠ ও শহিদদের জন্য প্রার্থনা নির্দেশনা আছে। অস্থায়ী মসজিদ স্থাপন ও ইমাম নিয়োগের বিষয়ও বলা আছে। শেষে আসল কথাটা বলা আছে :

> '*This arrangement is required to boost up the morale of the service-men*'.
>
> 'যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশনা শেষ বিচারে যোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়েছিল।'[২৪]

---

২৩. মেজর এম এ মঞ্জুর গেরিলা বাহিনীর জন্য ১৯৭১ সালে এই পুস্তিকাটি রচনা করে প্রচার করেছিলেন। দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, একাদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৪৮৩

২৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, একাদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৬১৯

https://nagorikpathagar.org

তিন: 'রণাঙ্গনের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সেনারা কোন রণধ্বনি উচ্চারণ করে শত্রুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত, সেটাও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। যুদ্ধের রণধ্বনি যোদ্ধাদের যুদ্ধের প্রণোদনাকে প্রকাশ করে। জেড ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিল তাঁর বইয়ে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছিলেন। আমরা সেই বর্ণনা পড়তে পারি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্ট হচ্ছে এক লড়াকু বীর রেজিমেন্ট। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তারা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। হিমালয়ের এই পাহাড়ি উপজাতির সামরিক দক্ষতা পৃথিবী বিখ্যাত। এই গোর্খা বাহিনীকে সিলেটের রাধানগর ছোটখেল এলাকায় পাক-সেনাদের পাল্টা আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাৎপসরণ করতে হয়। রাধানগর ছোটখেল এলাকা মুক্তিযুদ্ধের কৌশলগত প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হওয়ার কারণে ভারতীয় বাহিনীর জেনারেল গিল লুনি, দুয়ারীখেল ও গোরা প্রাণে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সকল সেনা-সদস্যদের সংগঠিত করে একযোগে ছোটখেল আক্রমণ করে শাফায়াত জামিলকে দখল করার নির্দেশ দিলেন।

তৃতীয় বেঙ্গলের সেনারা প্রায় দেড় মাস ধরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত, এমনকি তারা মাঝে মাঝেই অভুক্ত থাকছে। তবুও দেশ-মাতৃকার জন্য তাঁরা এই আক্রমণে রাজি হয়। শাফায়াত জামিল স্বয়ং সেই আক্রমণে সেনাদের সঙ্গে থাকেন।

প্রায় একশ পঞ্চাশ জন যোদ্ধা এক সারিতে শত্রুর আবস্থানের দিকে এগোচ্ছে। লাইনের পরে শাফায়াত জামিল তার মাঝখানে কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নবী। শত্রুর অবস্থান মাত্র তিনশ গজ দূরে পৌঁছেই 'জয় বাংলা', **'ইয়া হায়দার', 'আল্লাহু আকবর'** ধ্বনিতে চারিদিকে কাঁপিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে শত্রু অবস্থানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েকটি ব্যাঙ্কারে রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধ হলো। ডেলটা কোম্পানির সৈন্যরা তখন এক অজেয়, অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কোনো বাধাই তাদেরকে আটকে রাখতে পারছে না। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে ছোটখেলের শত্রু অবস্থানগুলোর পতন হলো। অজেয় গোর্খা বাহিনী যে-ই অবস্থান দখলের লড়াইয়ে মাত্র একদিন আগে পরাজিত হয়েছিল, আজ সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের মুঠোয়। তৃতীয় বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি প্রমাণ করলেন, বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা বিশ্বের অন্য যেকোনো রেজিমেন্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অতুলনীয় তাদের সাহস, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম।'**

** সূত্র : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্র নভেম্বর; কর্নেল শাফায়াত জামিল (অব.), সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৮৪-৮৬

https://nagorikpathagar.org

পাঁচ

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের বোঝাতে ইসলামের প্রতীক ও চিহ্নের বিকৃত উপস্থাপন

১৯৭১ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ইসলামি দলগুলোর বেশিরভাগকেই স্বাধীনতার পর আইন ও অধ্যাদেশ জারি করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম-এর মতো দলকে বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধ করলেও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে নিষিদ্ধ করেননি। জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের অনেক নেতা-কর্মীকে রাজাকার, আল বদর, আল শামস সংগঠনে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হলেও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কোনো নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়নি।[২৫] পরে ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের আগে 'পলিটিক্যাল পার্টি অধ্যাদেশ'-এর সুযোগ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দলগুলোর অনেকেই তাদের পুরোনো নামে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নেয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সেসব দলের মধ্যে বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী-ই একমাত্র সক্রিয়। হতে পারে এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সবগুলো দলের দায় এককভাবে জামায়াতের ওপর দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়।

---

২৫. *একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*, চতুর্থ সংস্করণ, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা : ৬১

https://nagorikpathagar.org

জামায়াতে ইসলামীর স্বাধীনতা বিরোধিতার দায় পরবর্তীকালে চাপিয়ে দেওয়া হয় সব ধরনের ধারার ইসলামপন্থিদের ওপরে। অন্যদিকে চিত্র, কার্টুন, সিনেমাতে দাড়ি-টুপি পরা মানুষকে রাজাকার ও হত্যাকারী হিসেবে উপস্থাপন করা শুরু হয়।

আমার বন্ধু রাশেদ সিনেমাতে কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করছে রাজাকার কমান্ডার

যদিও অমুসলিম ত্রিদিব রায়, বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমর্থন করেছিলেন, তবুও কোনো অজানা কারণে পাকিস্তানি সমর্থকদের শুধু ইসলামি লেবাসেই উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৬] যেন ইসলাম ধর্ম অথবা ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। অর্থাৎ কিছু ইসলামি দলের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকে খোদ ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয় এবং একই সঙ্গে ইসলামের চিহ্ন-প্রতীক যারা সমাজে ব্যবহার করেন, তাদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার জন্য দায়ী বা এরাই ছিলেন—এমন ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন—শিশির ভট্টাচার্যের কার্টুনে এটা ধারাবাহিকভাবে দেখানো হয়েছে।

---

[২৬]. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৮৩-৮৪

https://nagorikpathagar.org

শিশির ভট্টাচার্যের কার্টুনে ৭১-এর ঘাতক দালাল, রাজাকার আল বদরের মাথায় টুপি, গোঁফবিহীন দাড়ি, মেসওয়াক করাসহ সকল ইসলামি চিহ্ন বর্তমান।
[সূত্র : 'এই গণজাগরণ ছাড়া এই শিল্পিত প্রতিবাদ সম্ভবত সৃষ্টি হতো না', কৌশিক আহমেদ, *Eidesh.com*, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৩]

সৈয়দ শামসুল হক রচিত বিখ্যাত মঞ্চনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এ রাজাকার পিতা তাঁর কন্যাকে পাকিস্তানি সেনা অফিসারের মনোরঞ্জনের জন্য পাঠাচ্ছে। রাজাকার পিতার পোশাক ও চরিত্র নির্মাণ লক্ষণীয়।

https://nagorikpathagar.org

এ ছাড়াও সিনেমা, নাটক, কবিতা ও পোস্টারে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মানেই ইসলামি নানান চিহ্ন, প্রতীক আর পোশাকে একটি চরিত্র চিত্রণ সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই একশ্রেণির মানুষ ইসলাম-বিদ্বেষের চর্চা খুব সচেতনভাবেই করে এসেছে, আর ইসলামপন্থিদের প্রকাশ্যেই হেনস্তা করে গেছে। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, ইসলামকে এভাবে প্রতীকায়িত করা এবং ইসলামের চিহ্ন বা কোনো প্রতীক মানেই তা দিয়ে রাজাকার বোঝানোর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধের পক্ষের সত্যিকারের তৎপরতা বা ধরা পড়া কোনো সত্যিকারের রাজাকার দেখে তা থেকে প্রতীকায়িতভাবে রাজাকারের ধারণা হাজির হয়নি বা চিত্রিত হয়নি; এটা হয়েছে পুরোপুরি একটা পরিকল্পিত ইসলাম-বিদ্বেষ থেকে। যেমন: মুক্তিযুদ্ধকালে যেসব রাজাকার ধৃত হয়েছিল, আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের ছবিতে আমরা দেখব–বেশিরভাগের পরনেই কোনো ইসলামি চিহ্ন বা প্রতীকের পোশাক ছিল না; স্বাভাবিকভাবে যেটা অনেক সময় থাকে। এমনকী কোথাও কোথাও স্বাভাবিক মুখে দাড়িও ছিল না। নিচের এই ছবিগুলো থেকে তা স্পষ্ট হয়।

রাজাকারদের আত্মসমর্পণের ছবি। [সূত্র : https://news. wikinut.com/img/ 2vuxg7c5-b- chm8y/Raz akars-surrendering]

https://nagorikpathagar.org

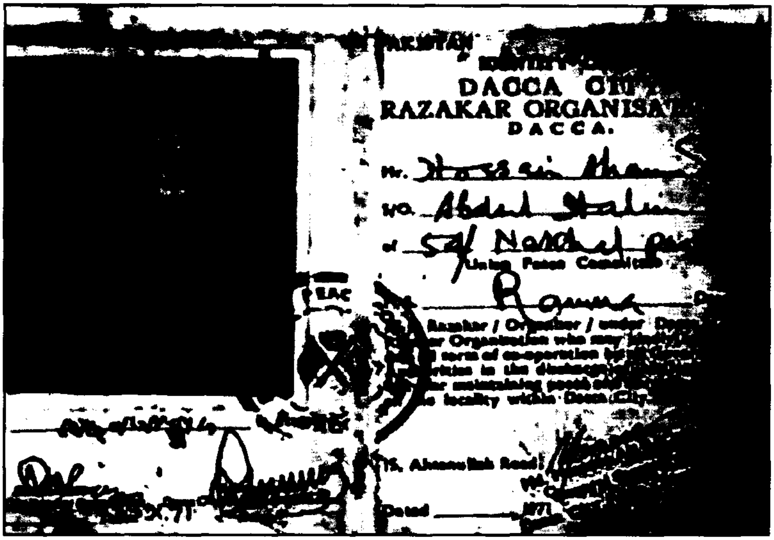

রাজাকারের সরকারি আইডি কার্ড। মুখে দাড়ি নেই, কোনো স্পষ্ট ইসলামি চিহ্নও নেই।
[সূত্র : BANGLADESH IN CIA CREST RECORDS, USAID fund was diverted to pay razakars, Probir K Sarker, *Dhaka Tribune,* January 24, 2017]

নিয়াজি রাজাকার ক্যাম্প পরিদর্শন করছে। রাজাকার কারও মুখেই দাড়ি নেই, এমনকী ইসলামি পোশাকও নেই। [সূত্র : মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট]

https://nagorikpathagar.org

মুক্তিবাহিনীর হাতে ধৃত রাজাকার। কারও মুখেই দাড়ি নেই বা তাদের পরনে ইসলামি পোশাক নেই। [সূত্র : Freedom in the Air, *The Daily Star* Archive]

১৬ ডিসেম্বরের পরে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধৃত রাজাকার। কারও মুখে দাড়ি নেই। [সূত্র : *Myth-busting the Bangladesh War of 1971', Sarmila Bose, aljazeera.com, 9 MAY 2011*]

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের ইসলামি লেবাসে উপস্থাপনের এই কাজটা করেছে বাংলাদেশের সেক্যুলারপন্থি ইসলাম-বিদ্বেষীরা। তারা মনে করেন, কেবল পাকিস্তান সমরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসকের বিরুদ্ধে নয় অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার কলোনিতুল্য সম্পর্কের বিরুদ্ধেই শুধু নয়; মুক্তিযুদ্ধের লড়াইটা বুঝি একই সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধেও হয়েছিল! যেন ৬৬ সালের ছয় দফা আদায়ের আন্দোলন ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন ছিল অথবা ওতে ইসলাম না মানার বা ইসলামবিরোধী কোনো দাবি ছিল। অথচ খুবই পরিকল্পিতভাবে এই কাজটাই করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। আর এটাই সেক্যুলারপন্থিদের প্রধান বয়ান আকারে এখনও বাংলাদেশে রয়ে গেছে। তারা এটা ধারাবাহিকভাবে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামের একটা বড়ো অবদান রয়েছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতাকে।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে 'রাজাকার' শব্দটা যে চিত্রকল্প তৈরি করে, তা একজন পরহেজগার মুসলমানের ছবি। দাড়ি-টুপি পরিহিত, চোখে সুরমা লাগানো একজন আলেম মুসলমানকেই রাজাকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

এই রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা জন্য। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীর সাথে মরণপণ যুদ্ধ করেই মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল।

১৯৭১ সালের ১ জুন জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারি করে আনসার বাহিনীকে রাজাকার বাহিনীতে রূপান্তরিত করেন। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৭ সেপ্টেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশে রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের সেনাবাহিনীর সদস্যরূপে স্বীকৃতি দেয়। রাজাকার বাহিনী ছিল প্রশিক্ষিত প্যারা মিলিটারি বাহিনী। অনেক ক্ষেত্রেই তারা উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাদের ইউনিফর্ম ছিল, বেতন ছিল এবং সামরিক সদস্যদের মতো রেশনও ছিল।

https://nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক কমিটমেন্ট নিয়ে হয়তো কেউ কেউ রাজাকার বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র কর্মহীন যুবকেরা রোজগারের আশায় দলে দলে রাজাকার বাহিনীতে ঢুকেছিল।

নিচের এই ছবিটি ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১-এর; পাকিস্তানের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ছবি। সেখানে দেখা যাচ্ছে—রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা তাদের প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব পাওয়ার আগের মুহূর্তে স্টেনগান খুলে আবার জোড়া লাগাচ্ছে।

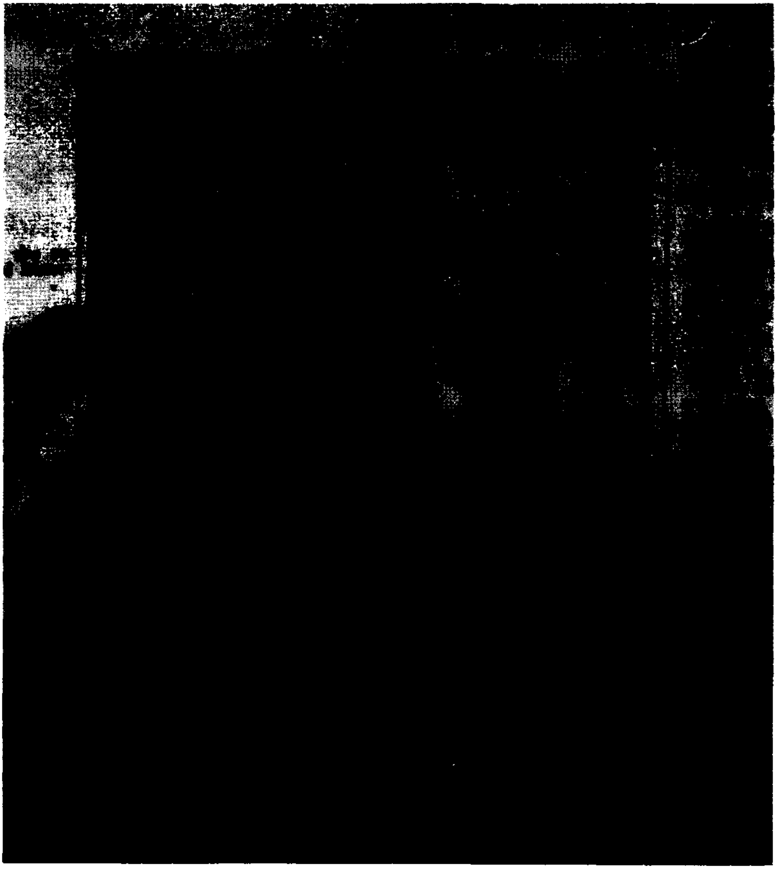

https://nagorikpathagar.org

এই প্যারা মিলিটারিদের মুখে কি দাড়ি, পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবী আর মাথায় ইসলামি টুপি আছে? নেই। রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের যত ছবি পাওয়া যায়, তারা প্রায় সকলেই সামরিক পোশাক পরিহিত প্যারা মিলিটারি। মাঝেমধ্যে লুঙ্গি-শার্ট পরিহিত কিছু রাজাকার বাহিনীর ছবিও দেখা যায়।

কিন্তু এখন পর্যন্ত দাড়ি-টুপিওয়ালা রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের ছবি দেখা যায় না। তাহলে এই প্রশ্ন করা সংগত—কেন ইসলামি পোশাকের সাথে রাজাকার চরিত্রটাকে মিলিয়ে দেওয়া হলো? কেন সিনেমা, নাটকে, কার্টুনে, চিত্রকল্প রাজাকার বলতেই একজন ইসলামি চরিত্রকে উপস্থাপন করা হলো?

এটা করাই হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের সাথে সেক্যুলারিজমের ফয়সালা হিসেবে দেখার ভারতীয় প্রজেক্টের বাস্তবায়ন হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ইসলামকে হেয় করার কুবাসনা থেকে।

মুক্তিযুদ্ধ আর ইসলাম পরস্পরবিরোধী কোনো প্রপঞ্চ নয়; বরং ইসলাম থেকে শক্তি নিয়েই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

ছয়

রাজাকার ছিল কারা

রাজাকার বাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, সেটা নিয়ে বোদ্ধা মহলে ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি আছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, মূলত জামায়াতের ছাত্র-যুব নেতা-কর্মীদের সমবায়েই এই প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হয়। আসলেই কি শুধু তাই? ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমানের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এ ধারণাটি পর্যাপ্ত নয়। 'ভাষা-আন্দোলন' খ্যাত কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন–

> 'বাঙালীদের রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার কতকগুলো কারণ ছিল। তা হলো–
>
> (ক) দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করলো, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেওয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, যারা এতদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিল, তাদের এক অংশ ওই বাহিনীতে যোগদান করলো।

https://nagorikpathagar.org

(খ) এতদিন পাক সেনার ভয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে তারা রাজাকারের দলে যোগ দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

(গ) এক শ্রেণির সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

প্রথমে রাজাকারদের দায়িত্ব ছিল মুক্তিবাহিনীর লোক খোঁজ করা এবং লোকের দেহ ও মালামাল অনুসন্ধান বা সার্চ করে দেখা যে কেউ কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে কি না। তারা মেয়ে-পুরুষ সবাইকে সার্চ করার নামে তাদের টাকা-পয়সা, অলঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পরে তাদের বোঝানো হলো যে, যুদ্ধে পাক সেনারা হারলে পাক সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার অপরাধে মুক্তিবাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করবে। সুতরাং জীবন রক্ষা করার জন্য মুক্তিবাহিনীর গুপ্ত আশ্রয়স্থলের সংবাদ তারা পাক সেনাদের জানিয়ে দিতে শুরু করলো।'[২৭]

মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাই শেখ নাসের ৩৫ দিন লুকিয়ে ছিলেন। তিনিসহ অনেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা আশ্রয় নিয়েছিলেন জামায়াত নেতা ও লেখক খন্দকার আবুল খায়েরের যশোরের বাড়িতে।[২৮]

তিনি লিখেছেন–

'আমি যে জেলার লোক; সেই জেলার ৩৭টি ইউনিয়ন থেকে জামায়াত আর মুসলিম লীগ মিলে ৭০-এর নির্বাচনে ভোট পেয়েছিল দেড়শতের কাছাকাছি। আর সেখানে রাজাকারের সংখ্যা ১১ হাজার, যার মাত্র ৩৫টি ছেলে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগারদের।

---

[২৭]. কামরুদ্দীন আহমদ, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা : ১২৫

[২৮]. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা : ৪২

https://nagorikpathagar.org

> ...আমার কিছু গ্রামের খবর জানা আছে, যেখানে ৭১-এর ত্রিমুখী বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে গ্রামে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেন যে, দুই দিকেই ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত মুতাবিক যে গ্রামের শতকরা ১০০ জন লোকই ছিল নৌকার ভোটার, তাদেরই বেশ কিছু সংখ্যক ছেলেদের দেয় রাজাকারে। যেমন কলাইভাঙ্গা গ্রামের একই মায়ের দুই ছেলের সাদেক আহমদ যায় রাজাকারে, আর তার ছোট ভাই ইজহার যায় মুক্তিফৌজে। ...এটাই ছিল অধিকাংশ অবস্থা।... যারা ছিল সুযোগ সন্ধানী, তারা সুযোগ পেয়েছে, ব্যাস রাজাকার হয়ে পড়েছে। ...এরপর এগারো হাজার রাজাকার যারা নৌকা (আওয়ামী লীগ- বর্তমান গবেষক) থেকে নেমে এসেছিল, তাদের সব দোষ গিয়ে আমাদের (ইসলামপন্থিদের) ঘাড়ে চাপল।'[২৯]

সুতরাং এখান থেকে রাজাকার বাহিনীর গঠন-কাঠামো ও এর সদস্যদের বিষয়ে যে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে, তা প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অনেকাংশে মিলছে না।

লক্ষণীয় যে, কামরুদ্দীন আহমদ রাজাকার বাহিনীতে যোগদানকারীদের তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন–

ক. দুর্ভিক্ষাবস্থার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া জনগোষ্ঠী

খ. যুদ্ধাবস্থার কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠী

গ. সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী এবং প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ পূরণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ।[৩০]

উদ্ধৃত ভাষ্য-বর্ণনা-বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে–'মুক্তিযুদ্ধকালে হত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতনের মতো অনৈতিক, অপরাধমূলক ও যুদ্ধাপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী ও অভিযুক্ত রাজাকার বাহিনীর একটি বিরাট অংশই এসেছিল ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে থেকে।

---

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫, ৬২

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৪১-৪৩

https://nagorikpathagar.org

এই বিরাট অংশের রাজাকার সদস্যের কেউ এসেছে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, পিডিপি, কেএসপির মতো দল থেকে এবং বাকিরা এসেছে রাজনৈতিক পরিচয়মুক্ত সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে।'[৩১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এ দেশের ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলসমূহের আরেকটি পরিপার্শ্বগত বাস্তব কারণ ছিল, এসব দলের নেতা-কর্মীদের ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি। শুধু ইসলামপন্থি দল নয়, এমনকী মওলানা ভাসানীও আসাম দিয়ে যখন ভারতে প্রবেশ করেতে যান, তখন তাঁকে জানানো হয়–'আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বর্ডার পার হওয়ার অর্ডার নেই।'[৩২]

---

[৩১]. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৪৫

[৩২]. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৬৫। উদ্ধৃত : সাইফুল ইসলাম, *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*, বস্তু প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা : ৮

https://nagorikpathagar.org

সাত

মুক্তিযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস খোঁজে : স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির চিঠি

আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রথম জানা যায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠনের দিনে। পরে ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ঘোষণা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সে ঘোষণার কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি। এমন কোনো কথা বা শব্দ এখানে নেই; বরং স্বাধীনতার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে–'In order to ensure for the people's of Bangladesh equality, human dignity and social justice.' অর্থাৎ স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; সংবিধানের চার নীতি নয়।[৩৩]

এই তিন নীতিই মুক্তিযুদ্ধের সারকথা। সংক্ষেপে এটাই মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এই চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্যই যুদ্ধ শেষে সংবিধান প্রণয়নের সময় ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ নামের চার নীতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বা শুরুতে

---

৩৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৭৪৩

https://nagorikpathagar.org

'ধর্মনিরপেক্ষতার' কথা না থাকলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কীভাবে সংযোজিত হলো, সেটার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। সেই লক্ষ্যে আমরা এখানে কিছু অনুসন্ধান করব।

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েমের জন্য একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ইতিহাসের দিক থেকে যেমন ন্যায্য, একইভাবে আইনি দিক থেকেও সিদ্ধ। কারণ, এই ঐতিহাসিক ঘোষণা ক্লাসিক রিপাবলিক রাষ্ট্র প্রক্লেইমের ন্যূনতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সংবিধান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার তিন নীতি বাদ দিয়ে শুধু ইতিহাসই অস্বীকার করেনি; বরং জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্য ঘোষণার সঙ্গে চাতুরী করেছে।

প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জনগণের উদ্দেশ্যে যে বেতার ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন–

> 'বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালী ভাই-বোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যাঁরা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাঁদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক "জয় বাংলা", 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ।'[৩৪]

১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণেও সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ থেকে মুক্তিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভাবাদর্শ বলে উল্লিখিত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুর দিকে কোন কথা বলে বা কোন চেতনাকে উজ্জীবিত করে দেশের সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল,

---

৩৪. *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২

https://nagorikpathagar.org

তার উৎকৃষ্ট নজির মেলে ১৯৭১-এর ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র চার দিন পর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি যে নির্দেশনাবলি প্রদান করা হয় তার মধ্যে। (পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য)

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রবাসী সরকার গঠন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাস্তব কারণেই ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ২৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়।[৩৫] ওই চিঠিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার গঠন ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও 'রাষ্ট্রীয় মূলনীতি'–যেটা আমরা পরবর্তীকালে সংবিধানে পাই, এ বিষয়ে কোনো কথা বা ইঙ্গিতও ছিল না। তবে ভারত সরকার এ আবেদনে কোনো সাড়া দেয়নি। বলা যায়, ফেলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারত সরকার স্বীকৃতির ব্যাপারটা নিয়ে বিলম্ব ও গড়িমসি করছিল। আর এভাবে ছয় মাস কেটে যায়। তখন ১৫ অক্টোবর '৭১ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আবার স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।[৩৬] সে চিঠিতে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়) ওপর জুলুম-নির্যাতনের বিষয়টি যুক্তি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে পেশ করা হয়। হিন্দুদের নির্যাতনের বিষয়টা উল্লেখ করে ভারতকে প্রভাবিত করার এটা একটা প্রচেষ্টা ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

ভারত সরকার এই দ্বিতীয় চিঠিতেও কোনো সাড়া দেয়নি বা এর কোনো জবাব দেয়নি। এভাবে আরও এক মাস পেরিয়ে যাচ্ছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি চলে আসে, অথচ ভারত সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে না। তাই সংগতভাবেই অনুমান করা যায়, এতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়ে। তখন বাংলাদেশ সরকার পরিস্থিতি বুঝে এবং সম্ভবত ভারতের প্রকৃত মনোভাব জানার পর ২৩ নভেম্বর '৭১ তারিখে প্রথমবারের মতো 'রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা' দিয়ে ভারত সরকারের স্বীকৃতি লাভের জন্য বিশেষ আবেদন জানায়। এই আবেদনে হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল এবং বলা-ই হয়, কেন ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এই চিঠিতে ভারত সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে

---

৩৫. *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৪১

৩৬. *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৪১

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের তেমন কোনো পার্থক্য হবে না। তাই ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না। ২৩ নভেম্বর প্রদত্ত চিঠিতে ভারতের উদ্দেশ্যে বলা হয়—

> 'You have shown unflinching support to the principles of democracy, secularism, socialism and a non-aligned foreign policy. We should like to reiterate here what we have already proclaimed as the basic principles of our State policy, i.e., democracy, secularism, socialism and the establishment of an egalitarian society. Where there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In our foreign relations, we are determined to follow a policy of non-alignment, peaceful coexistence and opposition to colonialism, racialism and imperialism in all its forms and manifestations. Against this background of this community of ideals and principles, we are unable to understand why the Government of India has not yet responded to our plea for recognization.
>
> আপনারা গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, সমাজতন্ত্র এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে আপনাদের অকাতর সমর্থন জানিয়ে গেছেন। আমরা এখানে এটা আবার পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে আমরা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছি এবং তা হচ্ছে, গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, সমাজতন্ত্র ও সমানাধিকারের সমাজ প্রতিষ্ঠা। যেখানে জাত, ধর্ম, লিঙ্গ বা বর্ণ বিশ্বাসের কারণে কাউকে বৈষম্যের শিকার হতে হবে না। আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, উপনিবেশ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার নীতি অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমন একটি সমাজের নীতি ও আদর্শের পটভূমিকায় আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না—কেন ভারত সরকার স্বীকৃতির বিষয়ে আমাদের অনুরোধে এখনো সাড়া দিল না।'[৩৭]

এই চিঠির আগে কখনো সেক্যুলারিজম বিষয়টা আমাদের রাষ্ট্রীয় ডকুমেন্টে নেই। এমনকি এই চিঠিতে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণার

---

৩৭. *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৬০

https://nagorikpathagar.org

কোনো সূত্রেও পাওয়া যায় না। কোথায়, কখন, কে এই ঘোষণা দিলো—এর কোনো হদিস পাওয়া যায় না। সর্বোপরি স্বাধীনতা ঘোষণার তিন নীতিকে পাশ কাটিয়ে এটা মূলনীতি বা মূল রাষ্ট্রনীতি হিসেবে কোথা থেকে গজালো—এরও কোনো হদিস নেই। এই বক্তব্য থেকে এটিই সুস্পষ্ট হয় যে, স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক কথা বলার ফল হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'সেক্যুলারিজম' শব্দটা আগামী রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে আমরা প্রথম শুনি ২১ অক্টোবরে বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে দেওয়া বক্তৃতার সময়ে।*

ভারত সরকারকে এই চিঠি দেওয়ার কয়েকদিন আগে কলকাতার সল্ট লেকে শরণার্থী শিবিরে ১৮ নভেম্বর আওয়ামী লীগ একটি জনসভা করে। সেখানেই তারা ঘোষণা দেন, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজবাদই আমাদের লক্ষ্য। এই জনসভার খবর প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকার ১৯ নভেম্বর সংখ্যায়।[৩৮]

এই সভায় মূল বক্তা ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মীজানুর রহমান চৌধুরী। তিনি বলেন—

> 'বিশ্বে একটি মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে। তা হলো ভারত। আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোও তাই। আমরা ইতোমধ্যেই মুক্ত এলাকায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কায়েমের কাজ শুরু করে দিয়েছি।'[৩৯]

তবে এর আগেও প্রবাসী সরকারের 'সংগ্রামী অভিনন্দন : বাংলাদেশ পরিষদ সদস্যবর্গের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ'-এ সেক্যুলারিজমের প্রসঙ্গটা পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছেন—

> 'অসাম্প্রদায়িকতা বা "সেক্যুলারিজমের" মহান আদর্শ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমরা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছি। এই একটি বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট থাকতে হবে। কোনো প্রকারে সাম্প্রদায়িকতার মালিন্যে যেন আওয়ামী লীগের সদস্যবৃন্দের নাম কলঙ্কিত না হয়, সে বিষয়ে

---

* বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪

৩৮. *জয়বাংলা*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র, ১ম বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭১, মুজিব নগর, পৃষ্ঠা : ৭

৩৯. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ১০

https://nagorikpathagar.org

> আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। গণতন্ত্র অর্থই হলো অসাম্প্রদায়িকতা। যেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সেখানে গণতন্ত্র কোনোদিন কার্যকর হতে পারে না। আজ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই অসাম্প্রদায়িকতা বা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাস করতে হবে।'[৪০]

সৈয়দ নজরুল ইসলামের বক্তব্যটি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রে অন্তর্ভুক্ত নেই। আমরা এখানে ভিন্ন সূত্র নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল* থেকে ব্যবহার করছি। সে কারণেই এই ডকুমেন্টটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছুটা কম বলে অনেকে দাবি করতে পারেন। তবে সূত্র হিসেবে এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বইটির সম্পাদক আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এবং সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একসময়ের নেতা। আর আমরা যদি বক্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করি, তা হলে দেখতে পাব, এই সেক্যুলারিজমের উল্লেখ করা হয়েছে গণতন্ত্রের সমার্থক শব্দ হিসেবে। এটাই বরং সেক্যুলারিজম শব্দটা তুলে আনার জন্য সাফাই হিসেবে সঠিক। অন্তত ইসলাম বিদ্বেষমূলক অর্থে সেক্যুলারিজম শব্দের ব্যবহারের চেয়ে। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদ তার *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল* বইয়ে যা বলেছেন, তাকে একেবারেই যথার্থ ব্যাখ্যা বলা যাবে না। তিনি বলেছেন–

> '১৯৭২ সালের সংবিধানে ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রেক্ষাপটে ছিল পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকের ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঐতিহ্য। আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে প্রচার চালিয়ে আসছিল। এর কারণ ছিল, পার্শ্ববর্তী হিন্দু অধ্যুষিত ভারত এবং দেশে বিপুল পরিমাণে হিন্দু জনশক্তির অবস্থান (প্রায় ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ) এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দাবি উত্থাপনের ব্যাপারে এরা গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতো। কেবলমাত্র তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ই নয়, জীবন যাপনের সর্বস্তরে তাদের সঙ্গে সম অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি প্রদানের ঐতিহ্যগত প্রেরণাও এর উপলক্ষ হিসেবে কাজ করছিল।

---

৪০. নুহ উল আলম লেনিন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৯৫।

https://nagorikpathagar.org

> এমতাবস্থায় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা অর্জনের ওপর বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বহন করে।'[৪১]

এখানে 'আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে প্রচার চালিয়ে আসছিল'—এই দাবির পক্ষে মওদুদ আহমদ কোনো তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। এটা যদি আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হয়েই থাকে, তবে কোন রাজনৈতিক দলিলে তা আছে, তার স্পষ্ট সূত্র দেওয়া উচিত ছিল। মওদুদ আহমদ তা করেননি। এক্ষেত্রে ধারণা করা যেতে পারে, তিনি সম্ভবত ১৯৭২ সালের পরের আওয়ামী লীগকে বলার চেষ্টা করেছেন; এর ভিত্তিতেই ১৯৭১ সালের আওয়ামী লীগের বক্তব্য নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার এই অনুমান পুরোটাই ভিত্তিহীন।

ওদিকে সেক্যুলারিজম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলে হিন্দু সম্প্রদায় যে সর্বাংশে প্রীত হয়েছিল, তা নয়। ১৯৭২ সালে আওয়ামী মন্ত্রিসভার জনৈক হিন্দু মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কুলদীপ নায়ার উদ্ধৃত করেছেন—

> 'পাকিস্তান আমলে হিন্দুরা স্বাধীন সেক্যুলার বাংলাদেশের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। কারণ, পাকিস্তান আমলে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হিসেবে আইনতভাবে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হতো। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে সেই বিশেষ অধিকার রহিত করা হয়, হিন্দুদেরকে এখন মুসলমানদের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হবে।'[৪২]

কুলদীপ নায়ার সেই মন্ত্রীর নাম বলেননি, কিন্তু ১৯৭২-এর শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভায় একজনই হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন, তিনি হচ্ছেন ফণীভূষণ মজুমদার।

এই কারণে অনেকেই মনে করেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানে ঢুকিয়ে দেওয়া সেক্যুলারিজম নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় প্রভাব থেকে এসেছে। তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব আবুল ফাতেহ বলেছেন—

> 'Secularism came by compulsion because Mujibnagar Government (he Provisional Government) was in India and heavily dependent on India for moral, material and diplomatic support.'

---

৪১. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, জগলুল আলম অনূদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১২০-১২১

৪২. Shaukat Hassan, 'India-Bangladesh Political Relations during the Awami League Government, 1972-75', Unpublished PhD Thesis, Australian National University, April 1987, p. 77.

https://nagorikpathagar.org

'অর্থাৎ সেক্যুলারিজম বাধ্যতামূলক নীতি হিসেবে এসেছে। কারণ, মুজিবনগর সরকার [অস্থায়ী সরকার] ভারতে ছিল এবং ভারতের নৈতিক, বস্তুগত ও কূটনৈতিক সমর্থনের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল।'[৪৩]

এ ছাড়া খুব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির এই অকস্মাৎ অনুপ্রবেশ শুধু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতেই দাঁড়ায় না; মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বলে খ্যাত গোলাম আযমকেও তাঁর মুক্তিযুদ্ধবিরোধিতার অজুহাত তৈরিতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে গোলাম আযম লিখেন–

'যারা মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিল এবং যারা চেয়েছিল যে, দেশে আল্লাহর আইন ও রাসূলের প্রদর্শিত সমাজ ব্যবস্থা চালু হোক, তারা আরও বড় সংকটের সম্মুখীন হলো। তারা তো স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তের বিরোধী ছিল। তদুপরি স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনকারীদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী চেহারা তাদেরকে চরমভাবে আতঙ্কিত করে তুললো। তারা মনে করল যে, ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও যখন ইসলাম বিজয়ী হতে পারল না, তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা যদি ভারতের সাহায্যে কোনো রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে, তাহলে সেখানে ইসলামের বিজয় কী করে সম্ভব হবে?

ভারতে মুসলমানদের যে দুর্দশা যাচ্ছে, তাতে ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ কায়েম হলে এখানেও কোনো দুরবস্থা নেমে আসে, সে আশঙ্কাও তাদের মনে কম ছিল না।

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের স্লোগান তুলতেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা যদি তারা না হতেন এবং ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া যদি আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন, তাহলে ইসলামপন্থিদের পক্ষে ওই আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা খুবই স্বাভাবিক ও সহজ হতো।'[৪৪]

---

৪৩. *Ibid*, p. 77.

৪৪. গোলাম আযম, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, প্রকাশকাল ও প্রকাশক অজ্ঞাত, পৃ : ২১

https://nagorikpathagar.org

আট

মুক্তিযুদ্ধে দেশের আলেম সমাজের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে দেশের আলেমসমাজ কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—এ প্রসঙ্গে তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান তাঁর বিশ্লেষণে একটা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সে সময়ের ইসলামপন্থি দল বা সামাজিক সংগঠনগুলোকে তাদের ঝোঁক বা অনুসৃত ধারা অনুসারে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সেই সময়ে বাংলাদেশের আলেমসমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁরা ছয় ধারায় বিভক্ত ছিলেন।'[৪৫]

- বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেম
- বিভিন্ন সাধারণ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেম
- সরকারি-আধা সরকারি মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক আলেম
- কওমী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক আলেম
- বিভিন্ন খানকাহ, সিলসিলা ও পির-মুরিদি সংশ্লিষ্ট আলেম এবং
- ইমাম, মুয়াজ্জিন ও ব্যক্তি পর্যায়ের আলেম

এই ধারাগুলোর মধ্যে ইসলামপন্থি দল জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের বাইরের আলেম সমাজের এক বিশাল অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় অবস্থান নেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই রণাঙ্গনে সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

---

৪৫. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০০৭, পৃষ্ঠা : ২২

https://nagorikpathagar.org

অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য খেতাবও পান। এর মধ্যে কিছু আমরা উল্লেখ করতে পারি–

১. সেই সময়ে বাংলাদেশের শীর্ষ আলেম হাফেজ্জি হুজুর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান নেন। তিনি পাকিস্তানিদের জালেম এবং মুক্তিযুদ্ধকে 'জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই' বলে অভিহিত করেন। মুক্তিযোদ্ধা মওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী তাঁর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে বলেন–

> 'আমি হাফেজ্জি হুজুরের খুব ভক্ত ছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন অনেক ছাত্র ট্রেনিং নিচ্ছিল। আমি হাফেজ্জি হুজুরের কাছে পরামর্শ চাইলাম। আমিও ট্রেনিংয়ে যাব কি না? বা এখন আমি কী করব? তিনি আমাকে বললেন, "পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করছে। সুতরাং তারা জালেম। জুলুম আর ইসলাম কখনো এক হতে পারে না। তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হও, ইসলাম মানো, তবে পাকিস্তানিদের পক্ষে যাও কীভাবে? এটা তো ইসলামের সঙ্গে কুফুরের যুদ্ধ নয়; বরং এটা হলো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। বাঙালিরা মজলুম, সুতরাং বাঙালিদের পক্ষে কাজ করো।" আমার মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার পেছনে এটাই মূল উৎসাহ-প্রেরণা।'[৪৬]

হাফেজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, যিনি মুক্তিযুদ্ধকে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ন্যায়যুদ্ধ বলে তাঁর অনুসারীদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

৪৬. শাকের হোসাইন শিবলি, *একাত্তরের চেপে রাখা ইতিহাস : আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে*, আল-এছহাক প্রকাশনী, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৪৯৭-৯৮

https://nagorikpathagar.org

২. মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেও পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামপন্থি তিনটি দলের মধ্যে একটি দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সক্রিয় আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এমনকী মুসলিম লীগ করা এক বৃদ্ধ হাজি সাহেব কেন মুক্তিবাহিনীর সাহায্যকারী, সে প্রসঙ্গে এক মুক্তিযোদ্ধা সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন, এই ধর্মপ্রাণ হাজি সাহেবের পুত্রবধূকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ধরে নিয়ে যায়। পরদিন তিনি গ্রামবাসীদের বলেন, 'আল্লাহ্ আছেন কি না, আল্লাহ্ জানেন। এই জানোয়ারদের হত্যা করাই এখন ইসলাম।'[৪৭]

৩. শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে দীর্ঘ বৈঠক করেন। এই বৈঠকের পর মাওলানা আজিজুল হকের প্রশংসা করে শেখ সাহেব পত্রিকায় একটি বিবৃতিও দিয়েছেন।[৪৮]

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ মার্চ গণহত্যা চলার পরও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়নি। কিন্তু সেই সময়ের বড়ো মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং মাদরাসা ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, লালবাগ মাদ্রাসা–সেই সময়ের বিখ্যাত এই দুই মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[৪৯]

৫. সিলেটের জকিগঞ্জ এলাকার মাওলানা আব্দুস সালামের বরাতে আমরা করাচির এক আলেমের কথা জানতে পারি। তিনি বলছেন–

'১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমি করাচি ইউসুফ বিন নুরী মাদ্রাসার ছাত্র। বাংলাদেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কিছু পাঞ্জাবি ছাত্র আমাদের সঙ্গে উৎপাত শুরু করে দিল। এই সময় একদিন মুফতি মাহমুদ সাহেব মাদ্রাসায় আসলে আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটি উপস্থাপন করলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–"ডরাও মাত, আল্লাহ্ হে।" মুফতি সাহেবের আগমন সংবাদে আসরের নামাজের পর পর প্রচুর রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং সাংবাদিক এসে উপস্থিত হলেন মাদ্রাসায়। এই সময় একজন নেতা

---

৪৭. *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা: 'সাহসের সমাচার', পৃষ্ঠা : দুই

৪৮. সৈয়দ মকসুদ, *দ্রাবিড় বাংলার রাজনীতি*, প্রকাশনা নগর, সাহিত্য ও প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৪

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৪

https://nagorikpathagar.org

মুফতি সাহেবকে প্রশ্ন করলেন- "হযরত গাদ্দার কো গ্রেফতার কার লে আয়া, লেকিন আবি তাক কাতল্ বী নেহি কিয়া?" প্রশ্ন শুনেই মুফতি সাহেব খুব ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- "গাদ্দার কৌন, গাদ্দার কৌন?" অতঃপর নিজেই বললেন– "শেখ মুজিব গাদ্দার নেহি, অহ সুন্নি মুসলমান হে। হার্ সুন্নি মুসলমান কি জান আওর মাল কি হেফাজত কার্ না হার্ সুন্নি মুসলমানকে লিয়ে ওয়াজীব হে।" পরের দিন এই কথা করাচির পত্রিকাগুলোতে এসেছিল।'[৫০]

৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' পাকিস্তানের আমির ছিলেন মুফতি মাহমুদ। সেই সময়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পূর্ব পাকিস্তানের আমির ছিলেন মাওলানা আজিজুল হক (পরবর্তীকালে শায়খুল হাদিস হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন)। বর্তমান পাকিস্তানের শীর্ষ নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান হলেন মুফতি মাহমুদের ছেলে। তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী ও পিপলস পার্টি মিলে মুফতি মাহমুদের পেশওয়ারস্থ অফিস আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন পিপলস পার্টির নেতা ও লেখক তারেক ওয়াহিদ বাট তাঁর *নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: ইসলাম আওয়ার পাকিস্তান* গ্রন্থে।

মুফতি মাহমুদের বক্তব্য সর্বদাই বাঙালি মুসলমানদের পক্ষে ছিল। '৭০-এর নির্বাচনে পিপলস পার্টির পরাজয় এবং আওয়ামী লীগের বিজয় হলে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অসম্মতি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'যারা জাতীয় পরিষদের বৈঠকে ঢাকায় যাবে, তাদের পা ভেঙে দেওয়া হবে।' তখন মুফতি মাহমুদ জোর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'বর্তমান সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান এবং সংবিধান ও আইনবিষয়ক সকল বিষয়ই জাতীয় পরিষদে মীমাংসা করা।'[৫১]

---

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৯৩

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৪

https://nagorikpathagar.org

নয়

মুক্তিযুদ্ধে উপমহাদেশের আলেম সমাজের ভূমিকা

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শুধু দেশের আলেমরাই নন; দেশের বাইরে ভারতীয় আলেম, এমনকী পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো কোনো আলেম অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলেম-উলামাদের অবদান কম নয়। তাঁদের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁদের অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ভূমিকা* নামক গ্রন্থে।

১. পাকিস্তানি বাহিনীর জুলুম-নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানির (রহ.) সাহেবজাদা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও ভারতীয় পার্লামেন্টের লোকসভার সদস্য হযরত আসআদ মাদানি (রহ.)। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় নানা সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ভারতের মুসলমান সমাজে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রবল জনমত গঠনের কাজ করেন। পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারে বিশ্ববাসী এবং ভারতীয় মুসলমানেরা যেন বিভ্রান্ত না হন,

https://nagorikpathagar.org

সে জন্য আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, হায়দারাবাদ প্রদেশে নানা সভা-সমিতি, সেমিনার, কনভেনশন আয়োজন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত সংগঠিত করেন।[৫২]

২. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে–

'ধর্মের নামে, পবিত্র ইসলামের নামে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের বুকে যে অমানুষিক নির্যাতন চালাইতেছে, পবিত্র ইসলাম ধর্মে এই বর্বরতার অবকাশ মাত্র নাই, এরূপ কল্পনায়ও মহান ইসলামের বুক কাঁপিয়া উঠে।'[৫৩]

৩. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার ও বিচারের প্রতিবাদে ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তাদের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে–

'শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের গ্রেপ্তার এবং তাহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা পরিচালনার খবর শুধু জমিয়তে উলামাই নয় বরং বিশ্বের প্রত্যেকটি মানবদরদী মাত্রেরই অন্তরে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। শেখ সাহেবকে মুক্তিদান এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান করতঃ দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় মানুষের সান্ত্বনার ব্যবস্থার জন্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই ওয়ার্কিং কমিটি জোরালো দাবি জানাইতেছে। শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা প্রত্যাহার এবং পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক সমাধান দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় মানুষের আনন্দই নয়, বরং স্বয়ং পাকিস্তানের শক্তি এবং সুনাম বৃদ্ধি করিবে বলিয়াও জমিয়তে উলামা মনে করিতেছে।'[৫৪]

৪. ওই একই সভায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে–

'বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান, ধর্মদ্রোহিতা কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহিতা তো নয়ই, বরং শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদ, জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ,

---

৫২. শাকের হোসাইন শিবলি সম্পাদিত, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ভূমিকা*, আলেম মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা : ৭, ৮

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ১০

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৯

https://nagorikpathagar.org

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের আর্তনাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ইহা সক্রিয় প্রতিবাদ হিসেবে দোষণীয় তো নয়ই, বরং অভিনন্দনযোগ্য।'[৫৫]

৫. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মতে–

'বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান প্রকৃতপক্ষে মানবিক অধিকারে বাংলাদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং এই গণঅভ্যুত্থান পরিস্থিতির জন্য একমাত্র পাকিস্তান সরকারই পুরোপুরি দায়ী। পাকিস্তান সরকার যদি তাহাদের জঙ্গি মেজাজ এবং হঠকারী প্রকৃতির বশ না হইয়া ঠাণ্ডা মাথায় মানবিক এবং ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে তাহাদের আচরণ এবং নীতি নির্ধারণ করিতেন, তবে বাংলাদেশের বুকে এমন করুণভাবে মানবতার বিলাপ কান্না শুনিতে হইতো না, লক্ষ লক্ষ মজলুমের খুনে বাংলার বুক ভাসিত না। উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোলে আকাশ পাতাল মুখরিত হইত না। দেশদ্রোহিতা, ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের নয়, বরং ইয়াহিয়া খানেরই বিচার চাই। প্রকৃত ধর্মদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী এমনকি গোটা পাকিস্তানের শত্রু বলিতে গেলে ইয়াহিয়া খানকেই বলতে হয়।'[৫৬]

৬. স্বাধীনতা যুদ্ধের একপর্যায়ে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর উপমহাদেশের দিকে যাত্রা করে, তখন মাওলানা আসআদ মাদানি (রহ.) সহস্রাধিক মুসলমানকে নিয়ে দিল্লির রাজপথে মিছিল করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করা হয়।[৫৭] এর আগে তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল ও ১৮ আগস্ট কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত জমিয়তের কনভেনশন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুই দফায় দুটি রেজ্যুলেশন পাস করেন। এ ছাড়া তিনি

---

[৫৫]. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৯

[৫৬]. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৯, ১০

[৫৭]. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ২২

https://nagorikpathagar.org

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা এলাকায় বাংলাদেশিদের জন্য শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থা করেন এবং জমিয়তের পক্ষ থেকে নিয়মিত রিলিফ বিতরণের ব্যবস্থা করেন।[৫৮]

মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু মাওলানা সাইয়্যেদ আসআদ মাদানি (রহ.)

৭. *মাসিক মদীনা* পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেছেন–

'আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পর মুফতি মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তখন জমিয়তের নেতা-কর্মীদের বললেন, পাকিস্তান শাসকদের বন্ধু এখন আমেরিকা। আমেরিকা যাদের বন্ধু তারা আমাদের শত্রু। তোমরা বাংলাদেশের পক্ষে লড়াই কর। তোমাদের এদেশে থাকতে হবে। এদেশের পক্ষেই কাজ করে যাবে। শেখ সাহেবের আন্দোলনে শরিক হবে।'[৫৯]

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামই ছিল এ দেশের আলেমদের একমাত্র দল, যা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। তাই বাকশালের সময় বঙ্গবন্ধু সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করলেও আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার কারণে জমিয়তকে নিষিদ্ধ করেননি।

---

৫৮. banglamail24.com http://archive.is/2ZI33

৫৯. শাকের হোসাইন শিবলি, *একাত্তরের চেপে রাখা ইতিহাস : আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে*, আল-এছহাক প্রকাশনী, জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৪৬০

https://nagorikpathagar.org

পশ্চিম পাকিস্তানে জমিয়তের সেক্রেটারি মুফতি মাহমুদ ২৬ মার্চের আগে ঢাকা এসে পূর্ব পাকিস্তান অংশের নেতাদের বলে গিয়েছিলেন, 'আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলুন, দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহিত করুন।'[৬০]

৮. ভারতের দেওবন্দ মাদরাসা কেন্দ্রিক আলেমদের সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অনেক ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাঁরা স্পষ্টভাবে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে হত্যা করছে, এ বিষয়ে অনেকগুলো বিবৃতিও দিয়েছিল। 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর ফতোয়াগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত শায়খুল ইসলাম হজরত হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-এর যে জীবনী বের হয়েছে, সেই বইটির শেষে পরিশিষ্ট আকারে দেওয়া হয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক আলেম ড. মুশতাক আহমেদ 'শায়খুল ইসলাম হজরত হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম' শিরোনামে তথ্য ও তত্ত্ববহুল অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগ থেকে এই অভিসন্দর্ভের জন্য মুশতাক আহমেদকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ড. মুশতাক আহমেদের এই অভিসন্দর্ভটিই শায়খুল ইসলাম হজরত হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-এর জীবনী আকারে বের করেছে।

৯. ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ দিল্লি অফিস থেকে পূর্ববঙ্গ বিষয়ে যে রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়, এখানে আমরা তার হুবহু অনুবাদ তুলে ধরছি–

RESOLUTION EAST BENGAL
Office of jamiat-e- Ulema, Dilhi.
April 26-27, 1971

'জমিয়ত-ই-হিন্দের এই সভায় পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর অমানবিক নৃশংসতার জন্য গভীর দুঃখ এবং তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছে। পূর্ব বাংলায় এরই মাঝে ঘটে যাওয়া নৃশংসতা এবং বর্তমানে চলমান নিপীড়ন আজ পুরো সভ্য বিশ্ববাসীর জন্য উদ্বেগের বিষয়। ইসলাম ধর্ম কখনোই এই ধরনের রক্তপাত এবং তাণ্ডবলীলার অনুমতি দেয়নি।

৬০. *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, দশম পৃষ্ঠা

https://nagorikpathagar.org

যারা এই সংকটের মূলে আছেন তারা যদি তাদের বিশাল আন্তরিকতা, মহানুভবতা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত মনোভাব প্রদর্শন করতে পারতেন, তাহলে পারস্পরিক এই দ্বন্দ্ব এবং রক্তপাত এড়ানো সম্ভব ছিল। এতে করে বিশাল সংখ্যক মানুষের জীবন এবং ব্যাপক সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব ছিল।'[৬১]

জমিয়তে উলামার এই কার্য কমিটি সকল বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, বক্তা এবং বিবেকবান মানুষের কাছে এই আবেদন পেশ করেন, তারা যেন এই আমানবিক পাশবিকতা ব্যাপক রক্তপাত বন্ধে সোচ্চার হোন।

জমিয়তে উলামার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয় পূর্ব বাংলার সকল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি, যারা এই ধ্বংসযজ্ঞ, সীমাহীন বেইনসাফি, বর্বরতা, গণহত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন।

১০. ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়, সেটাও আমরা উক্ত গ্রন্থ থেকে বাংলা অনুবাদে উদ্ধৃত করতে পারি–

Jamiat-e-Ulema convention
MUSLIM INSTITUTE HALL, CALCUTTA
August 18, 1971

সিদ্ধান্তসমূহ

ক. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই অধিবেশনে উদ্বেগ সহকারে বলা হয় পূর্ব বাংলার ৮৫% মুসলিম বিদ্যমান এবং স্বাধীনতার মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাদের এই স্বাধীন মতাদর্শ পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা শাসনের বিরুদ্ধে; যারা তাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করছে এবং গণতান্ত্রিক চাহিদাগুলোকে দমন-নিপীড়নের মাধ্যমে বন্ধ করেছে।

---

৬১. মুশতাক আহমেদ, *শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) জীবনী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে, ২০০১, পরিশিষ্ট ১ (ইংরেজি থেকে অনূদিত)

https://nagorikpathagar.org

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই সম্মেলন একটি ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট যে, স্বাধীনতাকামীরা গণতন্ত্রের মূলনীতি, সাম্য ও সামাজিক ইনসাফের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে, যা মানব সভ্যতার জন্য ইসলামেরই অবদান।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ স্বাধীনতাকামীদের এই লড়াইয়ে খোলা মনে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান।

খ. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই সমাবেশ আরো কিছু অকাট্য প্রমাণ পাওয়ায় মনে করে যে, স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খান তার সেনাবাহিনীকে দিয়ে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং তারা সেখানে ১০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। ৭০ লক্ষ মানুষকে ভারতে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং পূর্ববাংলার ভেতরেই ৩০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন।

এই সমাবেশে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে পশ্চিম পাকিস্তানের এই অমানবিক নৃশংসতা ইসলামের মূল আদর্শের বিপরীত এবং ইসলামের চোখেও এটা অপরাধ।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ শক্তভাবে ফ্যাসিস্ট পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের ইসলামবিরোধী কার্যক্রমের নিন্দা করে।

গ. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই সমাবেশে প্রতীত হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার গণমানুষের আস্থাভাজন নেতা। সে কোনো অপরাধের কারণে অপরাধী নয় এবং তার কোনো দোষ নেই।

এই সম্মেলন আরও সন্তুষ্ট এই জন্য যে, শেখ মজিবুর রহমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করেননি; বরং জেনারেল আগা ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলা এবং এর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যাদের ৮৫%-ই মুসলমান।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই সমাবেশে আরও নিন্দা প্রকাশ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা সরকার জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপন আদালতে বিচার করছে। একই সময় জেনারেল ইয়াহিয়া তার পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে উসকে দিচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় লাখো মানুষের জীবন ও সম্পদ নিঃশব্দে ধ্বংস করার জন্য।

https://nagorikpathagar.org

ঘ. এই সম্মেলনে প্রশান্তি সহকারে উল্লেখ করে বলা হয় যে, ভারত সরকার পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি তাদের মানবিকতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদেরকে দিয়েছে আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপত্তা। পূর্ব পাকিস্তানের লাখো মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দমন নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য।

সমাবেশে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তার সহকর্মীরা একটি রাজনৈতিক সমাধানের নিশ্চয়তা দিয়েছে, যা নতুন ও স্বাধীন পূর্ববাংলার (বাংলাদেশ) উদয়কে সম্ভব করে তুলবে এবং যা নতুন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে সহায়তা করবে।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সমাবেশে আরও বলা হয়, তারা অন্তরের অন্তস্থল থেকে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং তারা আশা করছেন ইন্ডিয়ান সরকার বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রকে যথাসময়েই স্বীকৃতি প্রদান করবেন।[৬২]

১১. পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন শীর্ষ নেতা পিপিপির মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, মাওলানা কাওসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ প্রমুখ, এক বিবৃতিতে এসব বাহিনীকে অবিলম্বে বিলুপ্ত করার দাবি জানান।[৬৩]

পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য বামপন্থি দলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন না করে বরং তারই বিরুদ্ধে আল বদর সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ায় অধ্যাপক গোলাম আযম ১২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে মাহমুদ আলী কাসুরীর সমালোচনা করেন।[৬৪]

---

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৫০৫-৫০৮ (ইংরেজি থেকে অনূদিত)

৬৩. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০০৭, পৃষ্ঠা : ৪১

৬৪. *প্রাগুক্ত*

https://nagorikpathagar.org

পশ্চিম পাকিস্তানেও রাজাকারদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছিল, সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় 'রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে, যা *দৈনিক সংগ্রাম* ছাপিয়েছিল–

> 'ঠিক এ কারণেই পাকিস্তানি বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাক সেনানায়করা আর সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত। ... পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল পিপলস পার্টি ও তার মুখপত্র মুসাওয়াত সম্প্রতি ঠিক পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল নিষিদ্ধ আওয়ামী বিদ্রোহীদের সুরে সুর মিলিয়ে রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছে। এমনকি সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সংগৃহীত রেজাকারদের দলবিশেষের নামে চালিয়ে এ আধাসামরিক সরকারি বাহিনীতে রাজনীতি ঢুকাবার অবৈধ প্রয়াসের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের অখণ্ডত্বের জন্য আত্মোৎসর্গী একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থানীয় বাহিনীর বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে ...যে রেজাকারদের সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সামরিক সরকারই বাছাই করছেন এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগিয়েছেন, তারা কী করে দল বিশেষের পক্ষ হয়ে অন্যান্য দলের কর্মীদের খতম করছে ভাবতে অবাক লাগে। অপবাদ মূলত সামরিক সরকারকে কী দেওয়া হচ্ছে না? ... সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেজাকাররা যখন শুধু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দালালদের খতম করছে, তখন তা যদি অন্য কোনো দলের কর্মী নিপাত করা হয়ে থাকে তা মানতে হবে, সে দলের কর্মীরা নিঃসন্দেহে ভারতীয় দালালি করছে।'[৬৫]

---

৬৫. *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, ঢাকা

https://nagorikpathagar.org

দশ

স্বাধীনতাপরবর্তী উপমহাদেশের আলেম সমাজের অবস্থান ও উপলব্ধি

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কিছু অদূরদর্শী বিভ্রান্ত মুসলমান ধর্মের নামে শুধু পাকবাহিনীকে সমর্থন করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদের জুলুম-নির্যাতনে মদদ জুগিয়েছে, নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে। স্বাধীনতার পর অধিকাংশই তাদের মুখোশ পালটালেও সেসব অপকর্মের কারণে নিরীহ মুসলমান আলেম-উলামা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর নেমে আসে মহাদুর্যোগ। সেই দুঃসময়েও শান্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হন হজরত আসআদ মাদানি (রহ.)। ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত হিসেবে তিনি বাংলাদেশে আসেন।

মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহসহ বেশ কজন শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে নিয়ে হজরত আসআদ মাদানি (রহ.) রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি তাঁকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, অধিকাংশ আলেম-উলামা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মোটেও বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন না; বরং সরেজমিনে বহু উলামায়ে কেরাম মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। বিষয়টি বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করায় এ দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমান্বয়ে দুর্যোগের কালো মেঘ দূর হয়ে যায়।

https://nagorikpathagar.org

অপরদিকে উলামায়ে কেরামকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে হজরত আসআদ মাদানি (রহ.) বলেছিলেন–

> 'এই বাংলাদেশ আপনাদের, আপনাদের এখানেই থাকতে হবে। এ দেশকে ভালোবাসতে হবে। এ দেশে থেকেই দ্বীন ও ঈমানের কাজ করতে হবে। এটা যেমন আপনাদের অধিকার এবং তেমনি কর্তব্যও বটে।'[৬৬]

১ অক্টোবর, ২০১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশাল অবদান রাখায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা (মরণোত্তর) পদক প্রদান করে বিরল সম্মানে ভূষিত করে। তাঁর পক্ষে এ পদক গ্রহণ করেন তাঁর মেজো ছেলে মাওলানা মওদুদ মাদানি। এ সম্মান সব দেওবন্দি উলামা-মাশায়েখের এবং এ দেশের সব মাদরাসা। মাওলানা আসআদ মাদানি (রহ.) উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোর প্রাণকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শূরা কমিটির সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া তার তত্ত্বাবধানেই মুসলিম পার্সোনাল আইন প্রণীত হয়।[৬৭]

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম, এমনকী বিশ্বের শীর্ষ আলিমগণও এই যুদ্ধকে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের বৈধ ও উচিত লড়াই বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মুফতি তাকী উসমানী (দা.বা.), যিনি *জাহানে দিদাহ* গ্রন্থে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনায় বলেছেন, 'বাংলাদেশের মাটিতে তারা কেয়ামত নামিয়েছিল।'

---

৬৬. তানজিল আমির, 'মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু মাওলানা সাইয়্যেদ আসআদ মাদানী', *যুগান্তর*, ২৫ মার্চ, ২০১৬, ঢাকা

৬৭. *প্রাগুক্ত*

https://nagorikpathagar.org

পাকিস্তানের বিশ্বখ্যাত, আলেম সাবেক বিচারপতি মুফতি তাকী উসমানীর বিশ্বভ্রমণ কাহিনি *জাহানে দিদাহ*-এর বাংলাদেশ ভ্রমণ অংশে এ সত্যের সমর্থন রয়েছে। তাঁরা সবাই মুক্তিযুদ্ধকে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ন্যায়সংগত যুদ্ধ বলেই আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> 'বাংলাদেশে থাকার সময় ১৯৭০ আর তার পরের সময় নিয়ে বিভিন্নজনের কাছে যে অসংখ্য রকমের গল্প শুনেছি, তা আমি যা ভেবে রেখেছিলাম তার চাইতে ভিন্ন ছিল। আরেকটা ব্যাপার হলো- এই জমির ওপর অত্যাচারের নগ্ন নৃত্য এতভাবে, এত রকমে হয়েছে যে, সেই গল্প অসম্ভব জটিল। আর তার জন্য দায় এত বহু রকমের চরিত্রের যে, হয়তো এই কালের সঠিক ইতিহাস কখনো লেখা সম্ভব হবে না। এসব ঘটনা নিয়ে উপমহাদেশের কোনো দেশের পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করার সাহস আছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া বাংলার কোণে কোণে এত অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে যে, তার শুমার করা মুশকিল। এখানের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে সব ঘটনা শোনার পর এই বিশ্বাস হয়েছে যে, এখানে যে কেয়ামত নেমে এসেছিল তা আমাদেরই পাপের ফল। আর নব্বই হাজার সশস্ত্র সৈনিকের এমন জমায়েতের এমন নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রকৃতি যেন এক তীব্র কষাঘাত দিয়ে এই আশঙ্কাজনক শিক্ষা দিয়েছে, এছাড়া একে আর কী বলা যায়!'[৬৮]

---

৬৮. *জাহানে দিদাহ*, মুফতি তাকী উসমানী, ইদারাতুল মারুফ, করাচি, (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই, ভূমিকার তারিখ : ১৫ মুহাররাম, ১৪১০ হিজরি/আগস্ট ১৭, ১৯৮৯, ভ্রমণকাল আগস্ট ১৯৮০), পৃষ্ঠা : ৩৮৭-৩৮৮ (মূল উর্দু থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ জাভেদ হুসেন)

https://nagorikpathagar.org

এগারো

মওলানা ভাসানী ও মুক্তিযুদ্ধ

মজলুম জননেতা দেওবন্দি আলেম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ১৯৫৭ সালের 'কাগমারী সম্মেলন' বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলার 'কাগমারী' নামক স্থানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলন থেকেই প্রথম বাঙালির স্বাধিকারের চেতনা উন্মোচিত হয়। মওলানা ভাসানী যখন কাগমারী সম্মেলনের আয়োজন করেন, তখন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত দল আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই কাগমারী সম্মেলনের আগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে বলা হয়–

> '...পাকিস্তান সরকার গত কয়েক বছর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি প্রভৃতি এমন সব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, যে সব চুক্তির দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক, ব্যবসাগত ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।'[৬৯]

---

৬৯. এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া, 'মওলানা ভাসানী ও কাগমারী সম্মেলন', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

https://nagorikpathagar.org

৫৬-র ১৯-২০ মে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনেও যুদ্ধজোটের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, 'কোনো বৈদেশিক শক্তির লেজুড়' হিসেবে না থেকে পাকিস্তান সরকারের উচিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা।[৭০] এই জাতীয় প্রস্তাবের কারণে আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ নেতার বিরাগভাজন হন মওলানা ভাসানী।

দুটি প্রধান বিষয়ে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত মীমাংসার অযোগ্য বিরোধে পর্যবেসিত হয়, যার একটি অবহেলিত শোষিত পূর্ব-বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আর অপরটি সকল সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ। দলের দুই প্রধান নেতার মধ্যে যখন মতবিরোধ চরমে, তখনই মওলানা ভাসানী দলীয় প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি। মওলানা ভাসানী ও প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে যে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছিল, তারই প্রেক্ষাপটে কাগমারী সম্মেলনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কাগমারী সম্মেলন এমন এক সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হয় যে, এই সম্মেলনের মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ থেকে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে অপসারণ করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ও সামরিক শাসন জারির মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল কাগমারী সম্মেলন।[৭১]

কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১৯৫৭ সালের ১৩ জানুয়ারি পূর্ব-বাংলার গরিব চাষি, মজুর, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের প্রতি এক আবেদনে মওলানা ভাসানী বলেন—

> 'এদেশ শুধু মন্ত্রী, মেম্বার, সরকারি কর্মচারীদের নহে, এদেশ অগণিত জনসাধারণের দেশ। যারা এদেশ পরিচালিত করেন, তারা শতকরা ৯৫ জন গরিব চাষি, মজুর, কামার, কুমার প্রভৃতি শ্রেণির জনসাধারণের টাকা দিয়েই চলে। ...পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবি পূর্ণ

---

৭০. *প্রাগুক্ত*

৭১. *প্রাগুক্ত*

https://nagorikpathagar.org

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবি এবং ২১ দফার বাকি ১৪ দফা দাবি পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

'দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমি আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি হতে সপ্তাহব্যাপী সন্তোষের কাগমারীতে এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেছি। দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করে জনগণের দাবি আদায়ের আন্দোলন জোরদার করুন।'

৩ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী 'কাগমারীর ডাক' শীর্ষক আরেকটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়–

- 'সাড়ে চার কোটি বাঙালির বাঁচার দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ডাক
- ২১ দফা আদায়ের ডাক
- চাষি-মজুর, কামার-কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সকল শ্রেণির মিলনের ডাক
- পূর্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার ডাক
- ২১ দফার পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তা সারা পাকিস্তানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত হতে মুক্তির মহান সনদ, যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।

মওলানা ভাসানী'[৭২]

কাগমারী সম্মেলনে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খানসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্যই যোগ দেন। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইল শহর থেকে সন্তোষের কাগমারী পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তায় তোরণ নির্মিত হয়। সেই তোরণগুলোর নামকরণ করা হয় বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ থেকে শুরু করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রিটিশ বিরোধী উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নেতাদের নামে। উল্লেখযোগ্য তোরণগুলোর নাম হলো–হজরত মুহাম্মাদ ﷺ তোরণ,

৭২. *প্রাগুক্ত*

https://nagorikpathagar.org

মহাত্মা গান্ধী তোরণ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী তোরণ, কাজী নজরুল ইসলাম তোরণ, মহাকবি ইকবাল তোরণ, নেতাজি সুভাস বোস তোরণ, হাজি শরিয়তুউল্লাহ তোরণ, শহিদ তিতুমির তোরণ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তোরণ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন তোরণ, সি. আর. দাস তোরণ, লেনিন তোরণ, স্ট্যালিন তোরণ, মাও সে তুং তোরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তোরণ, বায়রন তোরণ, শেলি তোরণ, মাওলানা রুমি তোরণ, হজরত ইমাম আবু হানিফা তোরণ, হজরত ইমাম গাজ্জালি তোরণ– এভাবে ৫১টি তোরণের নামকরণ করেন মওলানা ভাসানী। সর্বশেষ তোরণটি ছিল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নামে।[৭৩]

এই সম্মেলনে জহরলাল নেহরু, বিধান চন্দ্র রায় ও জামাল আবদুন নাসের চিঠি দিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণের একপর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে তাঁর সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন। ওই 'আসসালামু আলাইকুম'-এর তাৎপর্য উপস্থিত শ্রোতাদের মতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও ত্যাগের সংকল্প ওই 'আসসালামু আলাইকুম' ধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছিল।[৭৪] স্বাগত বক্তব্যে মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দু'ধরনের বক্তব্যই রাখেন। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপরও দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এই বলে যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দিলেও সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যা সাম্যনীতি পালিত না হলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে।[৭৫]

কাগমারী সম্মেলনেই প্রথম মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন, পক্ষান্তরে সম্মেলন থেকে ঢাকায় ফিরে সলিমুল্লাহ হলে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন,

---

৭৩. *প্রাগুক্ত*

৭৪. *প্রাগুক্ত*

৭৫. *প্রাগুক্ত*

https://nagorikpathagar.org

পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮% স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়ে গেছে।[৭৬] সম্মেলনের পর ২৬ মার্চ ১৯৫৭ মওলানা ভাসানী একটি প্রচারপত্র বিলি করেন, যার শিরোনাম ছিল– 'আওয়ামী লীগ কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন'। এই প্রচারপত্রে বলা হয়–

> 'ভাইসব! উভয় পাকিস্তানের সংহতি ও মিলন নির্ভর করে একমাত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের ওপর। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত সাড়ে চার কোটি বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে মুক্তি অসম্ভব। ...গদির মোহে মুসলিম লীগের সহিত হাত মিলাইয়া সাড়ে চার কোটি বাঙালিকে চিরকালের জন্য ক্রীতদাস বানাইতে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিসর্জন দিয়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাস করেছিল, তারাই পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী ও কোটিপতি শোষকদের সহিত হাত মিলাইয়া বর্তমানে আমার এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি, পোস্টার, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সারাদেশময় মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছে। এসব কুচক্রীদের দেশবাসী ভালো করিয়াই চিনে। তাহারা গত ৯ বছর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।'[৭৭]

কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন, তা আজও আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, পতাকা-মানচিত্র রক্ষার সংগ্রামে এবং সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা জোগায়। ঐতিহাসিক এই সম্মেলনের মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৫৭ সালেই মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনশন করেন।[৭৮]

মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি যিনি এক অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন, তিনি হলেন মওলানা ভাসানী। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর মতো একজন মওলানাকে 'কাফির' উপাধি দিয়ে তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। তিনি ৭ জানুয়ারি সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ দফা কর্মসূচি

---

৭৬. *প্রাগুক্ত*

৭৭. *প্রাগুক্ত*

৭৮. *মওলানা ভাসানীর রচনা*, পলল প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ২৩৬

https://nagorikpathagar.org

ঘোষণা করেন। ৯ জানুয়ারি সন্তোষ দরবার হলে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে একটা সর্বদলীয় সম্মেলন করেন। এরপর এক দফা দাবি তথা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টি করতে সারা দেশ সফর করেন।[৭৯]

মওলানা ভাসানী ১৯৭০-এর ২৩ নভেম্বর ভাসানী প্রকাশ্য জনসভায় স্বাধীনতার ডাক দেন। এরপর তিনি যে কয়েকটি জনসভা করেন সর্বত্র একই স্লোগান তুলেছিলেন, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান'। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেননি।[৮০]

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর যখন সারা দেশে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, তখন ৯ মার্চ পল্টনের বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের জল্লাদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে বলেন–

> 'অনেক হয়েছে আর নয়, তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই। 'লা-কুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার; পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না।... মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কিছু না হলে আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে মিলে ১৯৫২ সালের মতো তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলব।...অচিরেই পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবে।...বাঙালিরা মুজিবের ওপর আস্থা রাখেন, কারণ আমি তাকে ভালোভাবে চিনি'।[৮১]

যুদ্ধের শুরুতে তিনি নিরাপদ থাকলেও এপ্রিলে বাধ্য হন শরণার্থী হতে। ৪ এপ্রিল 'কাফের ভাসানী'র খোঁজে সন্তোষে হামলা চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। ভাসানী পালিয়ে যান এবং নানা কৌশলে পাকিস্তানিদের নজর এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত একটি কোষা নৌকায় করে ১০ এপ্রিল সিরাজগঞ্জ পৌঁছান। ১৫ এপ্রিল সীমান্ত পাড়ি দেন তিনি এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলার শিশুমারিতে আশ্রয় নেন। আসামের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর মাধ্যমে তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাঁর আসার খবর জানান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্য চান।[৮২]

---

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ২৩৭

৮০. হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২৩১

৮১. মীম মিজান, 'মওলানা ভাসানী ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান', *দৈনিক সংগ্রাম*, শুক্রবার, ১৭ মার্চ, ২০১৭

৮২. *প্রাগুক্ত*

https://nagorikpathagar.org

১৭ এপ্রিল একটি বিমানে করে ভাসানী কলকাতায় যান। শুরুতে পার্ক সার্কাসের পার্ক স্ট্রিটের কোহিনুর প্যালেসের পাঁচতলায় ভাসানী ও তাঁর সহকর্মীদের থাকতে দেওয়া হয়। একই ভবনে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পরিবারও থাকতেন।

মওলানা ভাসানী চীনের নেতা মাও সে তুং, চৌ এন লাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁদের অবহিত করেন যে, পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপকহারে গণহত্যা চালাচ্ছে।[৮৩] সেজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করেন। উপরন্তু তিনি তাঁকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ারও আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল মওলানা ভাসানী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের কাছে পাকিস্তান বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।[৮৪] ৩১ মে তিনি এক বিবৃতিতে বলেন–

> 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা এ সংগ্রামে জয়লাভ করবেই।'[৮৫]

৭ জুন মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন–

> 'বাংলাদেশের সব অঞ্চল আজ দশ লাখ বাঙালির রক্তে স্নাত এবং এ রক্তস্নানের মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীনতা আসবে।'[৮৬]

এরই মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দু'বার কোহিনুর প্যালেসে এসে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং তাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। ৯ সেপ্টেম্বর গঠিত মুজিবনগর সরকারের ৮ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন ভাসানী।[৮৭] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরে তিনি সর্বপ্রথম যে দাবিটি তোলেন, তা হলো–বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ।[৮৮]

---

৮৩. *প্রাগুক্ত*

৮৪. *প্রাগুক্ত*

৮৫. *প্রাগুক্ত*

৮৬. *প্রাগুক্ত*

৮৭. *প্রাগুক্ত*

৮৮. *প্রাগুক্ত*

https://nagorikpathagar.org

বারো

রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিপত্রে ইসলামি ভাব-প্রভাব

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে রণাঙ্গন থেকে মুক্তিযোদ্ধারা যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার একটা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের শিরোনাম *একাত্তরের চিঠি*। এই চিঠিগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের তৎকালীন ভাব, কল্পনা, মানসিক গঠন বোঝার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাঁরা কীভাবে চিন্তা করেছিলেন, কী তাঁদের উদ্দীপ্ত করত, কীভাবে ইসলামের ভাব-চিন্তা তাঁদের ভাবনায় ক্রিয়াশীল ছিল, সেটা বোঝার জন্য একাত্তরের চিঠি থেকে কয়েকটি নির্বাচিত চিঠি দেখা যেতে পারে।

এক. *১৮/৪/৭১*

মা,

আপনি এবং বাসার সবাইকে ***সালাম*** *জানিয়ে বলছি, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না। তাই ঢাকার আরও ২০ টা যুবকের সঙ্গে আমিও পথ ধরেছি ওপার বাংলায়। মা, তুমি কেঁদো না, দেশের জন্য এটা খুব ন্যূনতম চেষ্টা। মা, তুমি, এ দেশ স্বাধীনের জন্য দোয়া করো। চিন্তা কোরো না, আমি* ***ইনশাআল্লাহ*** *বেঁচে আসব। আমি ৭ দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারি কি বেশিও লাগতে পারে। তোমার চরণ মা, করিব স্মরণ। আগামীতে সবার কুশল কামনা করে* ***খোদা হাফেজ*** *জানাচ্ছি।*

তোমারই বাকী (সাজু)

চিঠি লেখক : শহিদ আবদুল্লাহ হিল বাকী (সাজু), বীর প্রতীক। পিতা : এম এ বারী।[৮৯]

---

[৮৯]. একাত্তরের চিঠি, প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯, পৃষ্ঠা : ১৮

https://nagorikpathagar.org

দুই.

২৩/৪/৭১

মা,

*দোয়া করো। তোমার ছেলে আজ তোমার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চলছে। বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী আজ তোমার সন্তানদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে তোমার সন্তানদের ইজ্জতের ওপর আঘাত করছে, সেখানে তো আর তোমার সন্তানরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আজ তোমার হাজার হাজার বীর সন্তান বাঁচার দাবি নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'তোমার নগণ্য ছেলে তাদের মধ্যে একজন।' **পরম করুণাময় আল্লাহর** কাছে দু'হাত তুলে **দোয়া** করি তোমার সন্তানরা যেন বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠীকে কতল করে এ দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। 'এ দেশের নাম হবে বাংলাদেশ', সোনার বাংলাদেশ। এ দেশের জন্য তোমার কত বীর সন্তান **শহিদ** হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। **ইনশাআল্লাহ্ শহীদের রক্ত** বৃথা যেতে দেব না। দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। **দোয়া** করো যেন জয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে আসতে পারি, নচেৎ-বিদায়।*

ইতি
তোমার হতভাগ্য ছেলে
খোরশেদ

চিঠি লেখক : মো. খোরশেদ আলম। মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর ২, বর্তমান ঠিকানা : ১-ই-৭/৪ মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।[৯০]

---

[৯০]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৯

https://nagorikpathagar.org

তিন.

২৭.০৬.১৯৭১

মা,

*আমার শত **সহস্র সালাম** ও কদমবুসি গ্রহণ করিবেন। আব্বার কাছেও তদ্রূপ রহিল। এতদিনে নিশ্চয় আপনারা আমার জন্য খুবই চিন্তিত। আমি **আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের দোয়ায়** বাংলাদেশের যেকোনো এক স্থানে আছি। আমি এই মাসের ২০ হইতে ২৫ তারিখের মধ্যেই বাংলাদেশে আসিয়াছি। যাক বাংলাদেশে আসিয়া আপনাদের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলাম না। আমাদের নানাবাড়ির ও বাড়ির খবরাখবর নিম্নের ঠিকানায় লিখিবেন। আমি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আসিয়াছি। আশা করি বাংলায় স্বাধীনতা আসিলেই আমি আপনাদের কোলে ফিরিয়া আসিব। আশা করি মেয়াভাই ও নাছির ভাই এবং আমাদের স্বজন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। যাক, বর্তমানে আমি ময়মনসিংহে আছি। এখান হইতে আজই অন্য জায়গায় চলিয়া যাইব। **দোয়া** করিবেন।*

পরিশেষে

আপনার স্নেহমুগ্ধ

ফারুক।

জয় বাংলা

চিঠি লেখক : শহিদ ওমর ফারুক। ভোলা জেলার সদর উপজেলার চরকালী গ্রামের আনোয়ারা বেগম ও আব্দুল অদুদ পণ্ডিতের পুত্র। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে গাইবান্ধার নান্দিনায় সংঘটিত যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।[৯১]

---

৯১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৯

https://nagorikpathagar.org

চার. **১৬ জুলাই, ১৯৭১ ইং**

মামণি আমার,

তুমি যখন ***ইনশাআল্লাহ্*** *পড়তে শিখবে, বুঝতে শিখবে, তখনকার জন্য আজকের এই চিঠি লিখছি। তোমার ছোট্ট বুকে নিশ্চয়ই অনেক অভিমান জমা (...) আব্বু তোমাকে দেখতে কেন আসে না। মা আমার, আব্বু আজ তোমার জন্মদিন তোমাকে বুকে নিয়ে বুক জুড়াতে পারছে না। এই দুঃখ তোমার আব্বুর জীবনেও যাবে না। কী অপরাধে তোমার আব্বু আজ তোমার কাছে আসতে পারে না। তোমাকে কোলে নিয়ে আদর করতে পারে না, তা তুমি বড় হয়ে হয়তো বুঝবে, মা। কারণ, আজকের অপরাধ তখন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আজকে এ দেশের জনসাধারণ তোমার আব্বুর মতোই অপরাধী। কারণ তারা নিজেদের অধিকার চেয়েছিল। অপরাধী দেশবরেণ্য নেতা, অপরাধী লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক- এ দেশের সব বুদ্ধিজীবী, কারণ তারা এ দেশকে ভালোবাসে। হানাদারদের কাছে, শোষকদের কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছুই নেই। এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ড এড়াবার জন্য লাখ লাখ লোক দেশ ত্যাগ করেছে। সেই দণ্ড এড়াবার জন্য তোমার আব্বুকে গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। তাই আজ বুক ফেটে গেলেও আব্বু এসে তোমাকে কোলে নিয়ে আদর করতে পারছে না। মনের মণিকোঠায় তোমার সে ছোট্ট মুখখানি সব সময় ভাসে, কল্পনায় তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিই। আর তাতেই তোমার আব্বুকে সান্ত্বনা পেতে হয়। আম্মু,* ***নামায পড়ে*** *প্রত্যেক ওয়াক্তে তোমার জন্য দোয়া করি।* ***আল্লাহ্ রহমানুর রাহিমের*** *কাছে* ***মোনাজাত*** *করি তিনি যেন তোমার আম্মুকে আর তোমাকে সুস্থ রাখেন, বিপদমুক্ত রাখেন। মামণি, তোমার আম্মু লিখেছে তুমি নাকি এখন কথা বল। তুমি নাকি বল, আব্বু জয় বাংলা গাইত।* ***ইনশাআল্লাহ্*** *সেই দিন বেশি দূরে নয় আব্বু আবার তোমাকে জয়বাংলা গেয়ে শোনাবে। যদি আব্বু না থাকি তোমার আম্মু সেদিন তোমাকে জয়বাংলা গেয়ে শোনাবে। তোমার আম্মু আরও লিখেছে, তুমি নাকি তোমাকে পিট্টি লাগালে আম্মুকে বের করে দেবে বলে ভয় দেখাও। তোমার আম্মু না ভীষণ বোকা। খালি তোমার আর আমার জন্য কষ্ট করে। বের করে দিলে দেখো আবার ঠিক ঠিক ফিরে আসবে। আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না। তোমার আম্মু দুঃখ পেলে এখন আর কাউকে বলবে না। একা একা শুধু কাঁদবে। তুমি আদর করে আম্মুকে সান্ত্বনা দিও, কেমন? তুমি আমার অনেক অনেক চুমু নিও।*

ইতি
আব্বু

চিঠি লেখক : আতাউর রহমান খান কায়সার। রাজনীতিবিদ, চট্টগ্রাম।[৯২]

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৯-৪০

https://nagorikpathagar.org

পাঁচ.

ঝালকাঠি, মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট

২৪/৭/৭১, বাংলা ৬ শ্রাবণ, ১৩৭৮

স্নেহের ফিরোজা,

তোমাকে ১৭ বৎসর পূর্বে সহধর্মিণী গ্রহণ করিয়াছিলাম। অদ্যাবধি তুমি আমার উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছ। কোনো দিন তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আজ আমি (...) তোমাদের অকূল সাগরে ভাসাইয়া পরপারে চলিয়াছি। বীরের মতো ***সালাম- ইনশাআল্লাহ*** *জয় আমাদের হইবে, দুনিয়া হইতে লাখ লাখ লোক চলিয়া গেছে* ***খোদার*** *কাছে। কামনা করি যেন সব* ***শহীদের কাতারে শামিল*** *হইতে পারি। মনে আমার কোনো দুঃখ নাই। তবে যে অপরাধে আমার মৃত্যু হইতেছে* ***খোদাকে*** *সাক্ষী রাখিয়া আমি বলিতে পারি যে এই সব অপরাধ হইতে আমি নিষ্পাপ। জানি না* ***খোদায়*** *কেন যে আমাকে এরূপ করিল। জীবনের অর্ধেক বয়স চলিয়া গিয়াছে, বাকি জীবনটা বাদল ও হাকিমকে নিয়া কাটাইবে। (...) পারিলাম না। (...) বজলু ভাইয়ের বেটা ওহাবের কাছে ১৫ হাজার টাকা আছে। যদি প্রয়োজন মনে কর তবে সেখান হইতে নিয়া নিয়ো।*

ইতি

তোমারই

বাদশা

(বাবা হাকিম, তোমার মাকে ছাড়িয়ে কোথাও যাইয়ো না)

চিঠি লেখক : শহিদ বাদশা মিয়া তালুকদার, গ্রাম : বাঁশবাড়িয়া, উপজেলা : টুঙ্গিপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ।[৯৩]

---

[৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৭

https://nagorikpathagar.org

ছয়.

ত্রিপুরা, ভারত
০২/১১/৭১ ইং
শ্রদ্ধেয় আব্বা,

আসসালামু আলাইকুম। *আশা করি* ***আল্লাহ্ তায়ালার অসীম রহমতে*** *ভালো আছেন। আপনাদের* ***দোয়ায়*** *আমিও ভালো আছি। পর সমাচার এই যে, গত ৫ জুন মুক্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য বাড়ি হতে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু দেশ ও বাঙালির এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তে যে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের জঘন্যতম অত্যাচার আমরা চোখ মেলে সহ্য করতে পারি না। আপনি তো জানেন শেখ মুজিবুর রহমান একজন মহান নেতা। সারা বাংলার জনগণ তাকে ভোট দিয়েছে, আপনিও তাকে বাংলার যোগ্য ও সাহসী নেতা হিসেবে ভোট দিয়েছেন। দেশের স্বার্থে তিনি যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তার ডাকে আমরা যদি পিছপা হয়ে যাই, তবে কোনো দিনই দেশের মুক্তি আসবে না। তাই দেশের স্বার্থে প্রতিটি যুবক-কিশোরকে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানিদের মোকাবিলা করা দরকার মনে করে বাড়ি থেকে চলে এসেছি। আব্বা, আপনাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, সেই জন্য আমাকে মাফ করে দিবেন। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, আপনি একসঙ্গে মা ও বাবার দায়িত্ব পালন করেছেন। নানা ধরনের আবদার ও অনেক দুষ্টমিতে আপনি রাগান্বিত হয়েছেন, আবার স্নেহভরে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়েছেন। যদি দেশ স্বাধীন হয় তবে বীরদর্পে আপনার নিকটে আবার ফিরে আসব। আর যদি কোনো যুদ্ধে* ***শহিদ হই*** *তবে আমাকে মাফ করে দিবেন। বড় ভাইকে বোঝাবেন, যাতে আমার জন্য কোনো চিন্তা না করে। হয়তো বা বোনেরাও ছোট ভাই হিসেবে অনেক কান্নাকাটি করে- তাদেরকেও সান্ত্বনা দিবেন। আসার সময় মুতি ভাইকে বলে এসেছি। আমার কাছে ১৬ টাকা ছিল, মুতি ভাই আসার সময় আমাকে ২০ টাকা দিয়ে বলেছে, তুই যা আমিও আসছি। জানি না মুতি ভাই কোথায় আছে, কী করছে।*

https://nagorikpathagar.org

ইন্ডিয়া এসে দেশের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমার গ্রামের আফতাব উদ্দিন ভুইয়া এমএলএ একটি ক্যাম্পের দায়িত্বে আছে। তার সঙ্গে ১ সপ্তাহ ছিলাম। ২১ দিন অস্ত্র ট্রেনিং শেষ করার পর বর্তমানে তারাইল-এর এক ক্যাপ্টেন আ. মতিন সাহেবের ক্যাম্পে আছি। ক্যাম্পের নাম ই কোম্পানি, ৩ নং প্ল্যাটুন, ৩ নং সেক্টর। ক্যাম্পটি আগরতলার কাছে মনতলায় অবস্থিত। বাড়ি থেকে আসার সময় ও ট্রেনিং সেন্টারে অনেক কষ্টই হয়েছে। বর্তমানে খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই ভালো। প্রতি মাসে কিছু বেতনও পাচ্ছি। প্রায়ই বর্ডারে ডিউটি করতে হয়। গত ২৮ তারিখে সিলেটের মনতলার কমলপুরে একটি অপারেশনে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের জয় হয়েছে। আমাদের এখানে রায়পুরার ১৪ জন আছি। আমাদের গ্রামের জহির, আ. হাই ও আব্দুল্লাহ আমার সঙ্গে আছে। এলাকার অনেকেই ট্রেনিং শেষে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদেরকে ছাড়ছে না। তিনি বলেন, আমরা দেশ স্বাধীন করতে এসেছি। দেশ স্বাধীন করে আমরা একসঙ্গে দেশে যাব। জানি না কবে দেশ স্বাধীন হবে, কবে দেশে আসতে পারব। সময় কম। ব্যারাক ডিউটির সময় হয়েছে। ডিউটিতে চলে যাব। পরে সুযোগ পেলে সব কিছু জানাব। আমার জন্য সবাইকে ***দোয়া*** *করতে বলবেন।* ***আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুক।***

আপনার স্নেহের পুত্র

নজরুল ইসলাম (নয়াব মিয়া)

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম (নয়াব মিয়া)[৯৪]

---

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯৩-৯৪

https://nagorikpathagar.org

তেরো

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে ইসলাম প্রসঙ্গ

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের বক্তব্য প্রচার, মুক্তিযোদ্ধা ও দেশের অবরুদ্ধ মানুষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার হতো। সেই স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানমালা পর্যালোচনা করলে আমরা খুব সহজেই দেখতে পাব, এই অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে ইসলামের বয়ান ও ভাবনা দিয়েই সবাইকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (মুজিবনগর)-এর সিগনেচার টিউন

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুরু বা সিগনেচার টিউন শুরু হতো সালাম জানিয়ে এবং এতে থাকত কুরআন তিলাওয়াত ও তরজমা।

> সকাল ৭টা।
> **আসসালামু আলাইকুম।**
> স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।
> বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করছি। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে... মিটারে... কি.হা.-এ। অধিবেশনের প্রথমে শুনুন তিলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা।[৯৫]

---

৯৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ১৫

https://nagorikpathagar.org

খ. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় অভিমত

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেসব সম্পাদকীয় বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো, এগুলো প্রচার-প্রোপাগান্ডার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, পাকিস্তান-সরকার কূটনীতিক পর্যায়ে এবং নিজের বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা মেশিন ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাত। সেসব মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মুখোশ খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পালটা তৎপরতার জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ছিল। এগুলো জানতে পারলে দেশের সাধারণ জনগণ ও রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধারা উদ্দীপিত হতো।

তাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নানা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেসব খবর প্রকাশিত হতো, সেগুলো খুব গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হতো। এর কারণ, পাকিস্তানের শাসকেরা নিয়মিতভাবে দেশ-বিদেশে প্রোপাগান্ডা চালাত যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো মুক্তিযুদ্ধ নয়; বরং ইসলামের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আগ্রাসনবাদী শক্তি অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ করছে। তাদের এই প্রোপাগান্ডা যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করেনি, তা এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হতো। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের পত্র-পত্রিকায় যেসব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় ৬ জুন, ১৯৭১। এটা ছিল নিম্নরূপ–

> 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম দেশের পত্রপত্রিকা সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তেইশ বৎসর পরে এবারই প্রথমবারের মতো সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পত্রপত্রিকার যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি মুসলিম দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আশা ও আনন্দের বিষয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে আমরা বিশ্ববাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়ে আসছি।'

https://nagorikpathagar.org

সিরিয়ার *আল-তাউরা* পত্রিকায় ২৭ মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল–

> 'পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান শুরু হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পাকিস্তানের মিলিটারি শাসকগোষ্ঠী দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক অবস্থা ফিরে আসুক, এটা চাননি। তাঁরা এটাও চাননি যে, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে হোক।'

তুরস্কের দৈনিক *জমহুরিয়াত*-এ ২৯ মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল–

> 'পশ্চিম পাকিস্তান তাদের কামান-বন্দুক দিয়ে পূর্ব বাংলাকে দমন করতে শুরু করেছে, কিন্তু একটু আগে বা পরে পূর্ব বাংলা তার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবে।'

মালয়েশিয়ার দৈনিক *উতশান মালয়েশিয়া* পত্রিকার ৩০ মার্চ তারিখে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল–

> 'পাকিস্তানের মিলিটারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং বুঝেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার জনগণের অবস্থা ও ভাগ্যের প্রতি ক্রমাগত অবহেলা ও উদাসীন মনোভাব পোষণ করায় বাংলাদেশের গণ-অসন্তোষ বিরাজ করছে। বর্তমানে ইয়াহিয়া খান পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, পূর্ব বাংলা কোনো স্বাধীন দেশের অংশ নয়; বরং পূর্ব বাংলাকে বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি।'

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (স্বল্পস্থায়ী মিশর ও সিরিয়ার একত্রিত নাম বা গামেলের মিশরের পুরানা নাম) আরবি সাপ্তাহিক পত্রিকা *রোসে আল-ইউসুফ*-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল–

> 'অনেক পর্যবেক্ষক এই ভেবে অবাক হয়েছেন যে, পূর্ব বাংলা এতদিন পরে কেন স্বাধীনতা চাইল! পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক বাস করে পূর্ব বাংলায়। অথচ পাকিস্তানের মোট সাধারণ বাজেটের ৪ ভাগের ১ ভাগের চাইতে কম অর্থ ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়।

https://nagorikpathagar.org

পাকিস্তানের উন্নয়ন সংক্রান্ত বাজেটের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম টাকা ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়। আর বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানিজাত আয়ের মাত্র ৪ ভাগের ১ ভাগ পায় পূর্ব বাংলা। সরকারি চাকরির মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং সামরিক বিভাগীয় চাকরির শতকরা মাত্র ১০ ভাগ পেয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সময় দেখা গেছে যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিই বেশি নজর দিয়েছে।'

সুদানের দৈনিক *আল-সাহাফা* পত্রিকার ৫ এপ্রিল তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল–

'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র দ্বারা বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে আসছিল বলে অভিযোগ করে আসছে। পূর্ব বাংলার এই অভিযোগের কারণ হলো–

১. পাকিস্তানি সামরিক অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. বেসামরিক সরকারি অফিসার পদে ৮০% পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩. পাকিস্তানের বার্ষিক আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

৪. রপ্তানিজাত আয়ের ৮০% ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্র ২০% ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়।

এ সকল কারণেই পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসনচক্র দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত মনে করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে পূর্ব বাংলার ১৭% আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৪২%। পূর্ব বাংলার অধিকার সচেতন মানুষের কাছে এখন বিষয়টি একেবারে খোলাসা হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত পাট, চা ও চাল বিদেশে রপ্তানি করে যে আয় পাকিস্তানের হয়, তা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্যই ব্যয় করা হয়। এ কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে তাদের সম্পদের

https://nagorikpathagar.org

শোষক ও বঞ্চনাকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব বাংলার মানুষের টাকা দিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে যে রাজধানী গড়া হলো, তাতেও খরচ করা হয়েছে ৫শ কোটি টাকা।

এ সকল ন্যায্য কারণেই পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসন চেয়েছে।'

আফগানিস্তানের দৈনিক *আফগান মিল্লাত*-এর এক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল–

> 'পশ্চিম পাকিস্তানি একচেটিয়া পুঁজিবাদী এবং ফৌজি নেতারা এ অবস্থা দেখতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না যে, পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা বাঙালির হাতে যাক। এ কারণেই তারা জাতীয় পরিষদের বৈঠক বানচাল করতে সচেষ্ট ছিল। এবং পরিষদের অধিবেশন বসবার আগে একটা কিছু গোঁজামিল দিয়ে বাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতা করতে ফন্দি এঁটেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খানই এসব বেআইনি ও অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর দাবি ছিল, যে কোনো সমস্যার সমাধানের পন্থা পরিষদের বৈঠকে বসেই স্থির করতে হবে।

পশ্চিমা শাসকচক্র দেখলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পূর্ব বাংলাকে শোষণমুক্ত করতে চান না, একই সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অনুন্নত ও বঞ্চিত প্রদেশগুলোকেও পুঁজিপতি ও সামরিক জান্তার শোষণ থেকে মুক্ত করতে চান। কাজেই ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি নস্যাৎ করার জন্য আঁটলেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্র- পূর্ব বাংলায় এঁরা পাঠালেন সেনাবাহিনী।'

কুয়েতের দৈনিক *আখবার আল-কুয়েত*-এর ৬ এপ্রিল তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল–

> 'শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাঁর দল পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচনে তাঁর দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করল। শেখ সাহেবের দাবি ছিল, ন্যায্য, আইন-সঙ্গত এবং গঠনমূলক। তিনি চাইলেন গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং দেশের সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে।

https://nagorikpathagar.org

> কিন্তু ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে সশস্ত্র ধ্বংসাভিযান চালিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে এই হত্যাকাণ্ড সৃষ্টির অপরাধে ইয়াহিয়া খানকে ভবিষ্যৎ বংশধররা কোনোদিন ক্ষমা করবে না।' (আবুল কাসেম সন্দ্বীপ অনূদিত)[৯৬]

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা বিষয়ক কথিকা

'আল্লাহর পথে জেহাদ'

মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা ইসলামের মধ্যে খোঁজা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ যে ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়ের যুদ্ধ, সেটা প্রমাণের জন্য নানা কথিকা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার করা হতো। তাঁর মধ্যে একটি কথিকার নাম ছিল 'আল্লাহর পথে জেহাদ'। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে 'আল্লাহর পথে জেহাদ' বলে প্রচার করা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাদের বলা হতো, 'কোরআনের দৃষ্টিতে ওরা শয়তানের বন্ধু এবং দোযখী। অতএব, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।'[৯৭]

এই কথিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল–যা থেকে আমরা স্পষ্ট হতে পারি যে, আমাদের যুদ্ধের বয়ান তৈরিতে মতাদর্শ হিসেবে 'ইসলাম' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। প্রচারিত এই কথিকাটি ছিল নিম্নরূপ–

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ

জুলাই, ১৯৭১

> 'মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, অথবা যে স্বভাবেরই হোক না কেন, আল্লাহ্ তায়ালা কতকগুলো বিষয় থেকে তাকে কখনো বঞ্চিত করেন না। একজন মানুষ অবিশ্বাসী হতে পারে, নাস্তিক বা কাফের হতে পারে, অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে পারে,

---

৯৬. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ১৯২-৯৪

৯৭. *প্রাগুক্ত*, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮৪

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু তবুও মানুষ হিসেবে তার কতকগুলো অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। সেসব অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা কারোরই নেই। এ অধিকারগুলো হচ্ছে- আলোর অধিকার, বাতাসের অধিকার, পানির অধিকার এবং মৃত্তিকার অধিকার। অর্থাৎ মানুষকে আলো থেকে বঞ্চিত করবার, বাতাস থেকে বঞ্চিত করবার, পানি থেকে বঞ্চিত করবার এবং মৃত্তিকা থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই'।

আল্লাহ্ তায়ালা চরমতম পাপীকেও এ সমস্ত অধিকার থেকে মাহরুম করেননি। সুতরাং যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা শাশ্বতরূপে কতকগুলো অধিকারের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত রেখেছেন, সেখানে পৃথিবীর কোনো প্রবল শক্তিরই অধিকার নেই সেই কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার। যখন মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে আল্লাহর নাফরমান হয়ে এ সমস্ত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে চায়, তখন সে মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ পাপী বলে চিহ্নিত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে যে নৃশংস অন্যায় লীলা চলছে, সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী এবং আল্লাহ্ তাআলার শাশ্বত ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের ঘরসংসার, কৃষিজীবন এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে জীবনযাপন করছিল- সেসব মানুষকে তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পথে যারা বের করেছিল, তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী। যে মানুষ ক্ষুদ্র এক মাটির ওপর ঘর বানিয়ে সংসারযাপন করেছে, যে মানুষ উৎসবে-আনন্দে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কে নির্লিপ্ত হচ্ছে, সেসব মানুষকে তাদের সকল প্রকার সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা শুধু যে মানবিক বিচারে অন্যায় তাই নয়, এটি জঘন্যতম পাপাচার এবং ইসলামের মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত। কোরআন শরিফের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ তায়ালা ফলবান বৃক্ষের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নদী ও সমুদ্রের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বাতাস এবং মৃত্তিকার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এই চারটি সম্পদের মধ্যে প্রকাশিত দেখতে চান।

অর্থাৎ কোনো মানুষ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাবে না, পানির অভাবে পিপাসার্ত থাকবে না, বাতাসের অভাবে নিশ্বাস রুদ্ধ হবে না

https://nagorikpathagar.org

এবং মৃত্তিকার অভাবে গৃহহারা হবে না। সুতরাং যেসব লোক বাংলাদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, বঞ্চনা এবং হত্যাকাণ্ডে সময়কে কলুষিত করছে, তারা ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করলেও পৃথিবীতে তারাই একমাত্র ইসলামবিরোধী। সুতরাং আল্লাহর লানৎ তাদের ওপর একদিন না একদিন পড়বেই।

যারা নিষ্পাপ, নিরপরাধ; যারা শুধু বাঁচার অধিকারের কথা ঘোষণা করতে চাচ্ছে, তাদের জয় একদিন হবেই। বাংলাদেশের মুসলমান অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে ধর্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। এ সব মানুষের বিরুদ্ধে যারা অন্যায়ভাবে মারণ অস্ত্র ধারণ করেছে, আমি ইসলামের নামে তাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ ঘোষণা করছি।

আমাদের জয় হবেই, আমাদের জয় অপরিহার্য।'
(সৈয়দ আলী আহসান রচিত)[৯৮]

মুক্তিযুদ্ধ যে আসলে আল্লাহর তরফ থেকে মুমিনদের জন্য পরীক্ষা, সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করা হয়েছিল নিচের কথিকাটিতে। আপনজনের মৃত্যু, ক্ষুধা, হতাশা, অন্যায়, অবিচার, পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক অত্যাচার যে আল্লাহর তরফ থেকে একটা পরীক্ষা, সেটা ভেবেই মুক্তিকামী মানুষ যেন তা সহ্য করার সাহস ও শক্তি পায় কথিকায় এমন আহ্বান ছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ

৮ অক্টোবর, ১৯৭১

॥ দ্বিতীয় অংশ ॥

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরিফের সূরা তওবাতে মুনাফেকদের সম্পর্কে হুজুর ﷺ-কে নির্দেশ করে বলেছেন–

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-
يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا-

---

৯৮ . প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮১-৮২

https://nagorikpathagar.org

অর্থ- হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন এবং তাদেরকে দমন করুন। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! ওই সব মুনাফেকগণ কথায় কথায়ই আল্লাহর নামে কসম খায়, পক্ষান্তরে তারা গর্হিত কথাবার্তা বলে ও মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কুফুরি কাজ করে এবং লোকসম্মুখে ওই সমস্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে, যেগুলোর সঙ্গে তাদের অন্তরের কোনো মিল নেই।

অর্থাৎ, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের কুমতলব হাসিল করার জন্য ওই সমস্ত অলীক ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে বেড়ায়, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ওরা হচ্ছে মুসলমান নামধারী বেঈমান। এজন্য ওই সব বেঈমানের কথায় কর্ণপাত না করে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ওদের ভাঁওতাবাজির উপযুক্ত জওয়াব দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের ওপর নির্দেশ জারি করেছেন।[৯৯]

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আন-নিসায় বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ-

অর্থাৎ, যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।[১০০]

তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গিয়ে যাঁরা মারা যাবেন, তাঁরা শহিদ ও অমর হয়ে থাকবেন এবং পরকালে অসীম সুখের অধিকারী হবেন।

যেমন কোরআন শরিফে আছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ-

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পার না।[১০১]

কারণ, তারা হলেন শহিদ এবং শহিদকে কখনো মৃত বলে অভিহিত করা ঠিক নয়।

---

৯৯. সূরা তাওবা : ৭৩-৭৪

১০০. সূরা নিসা : ৭৬

১০১. সূরা বাকারা : ১৫৪

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আরও বলেছেন, আমার নির্দেশিত জেহাদে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অংশগ্রহণ করে তাতে তোমরা উত্তীর্ণ হতে পারো কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে আমি যুগে যুগে বিভিন্ন জেহাদের সম্মুখীন হতে বাধ্য করবো এবং কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখবো, আমার নির্দেশের আজ্ঞাবহ হয়ে আমার এ সমস্ত অগ্নিপরীক্ষায় তোমরা কতটুকু উত্তীর্ণ হতে পার। তোমাদের মধ্যে যাঁরা এ সমস্ত কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ধৈর্য ও বীরত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারবে, একমাত্র তাঁদের জন্যই রয়েছে অসীম বেহেশতের শুভ সংবাদ। যেমন আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِيْنَ- الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-

অর্থাৎ, আমি কতকগুলো জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। সেগুলো হলো এই–

১. আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবেশে ফেলে দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করব, যেখানে চতুর্দিক থেকে ভয় ও আতঙ্ক তোমাদেরকে গ্রাস করতে চাইবে।

২. তোমাদেরকে অনাহারে ফেলে ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট দেব; আবার কোনো জিনিস থেকে বঞ্চিত রাখব, অর্থাৎ তখন কোনো খাবার দ্রব্য তোমরা খুঁজে পাবে না।

৩. তোমাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করে দেব; অর্থাৎ অত্যাচারীরা তোমাদের ধনদৌলত লুট করে নেবে ও বিনষ্ট করে দেবে, অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৪. আমি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং অত্যন্ত আপনজনকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেব। অর্থাৎ মেরে ফেলব।

৫. তোমাদের ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ এবং শস্য-সামগ্রীতে ভরা ক্ষেতের ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগ- যথা ঝড়-তুফান, বন্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেব।[১০২]

আমি তোমাদেরকে ওই সমস্ত বিপদে ফেলে পরীক্ষা করে দেখব- যাতে তোমরা ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে, ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য হতে বঞ্চিত হয়ে, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনহারা হয়ে, ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ

---

১০২. সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৬

https://nagorikpathagar.org

ও সুফলা জমির ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে, আমার ওপর থেকে ভরসা ছেড়ে দিয়ে একেবারেই হা-হুতাশে পড় এবং ন্যায়পথ থেকে সরে দাঁড়াও। ওই সমস্ত বিপদে ধৈর্যধারণ করে আমার নাম স্মরণ করে দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্য নিয়ে এবং সৎপথে থেকে ওই সমস্ত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যাও, অর্থাৎ ন্যায়নীতির ভিতর দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উঠার চেষ্টা কর। মনে রাখবে, সৎপথ ও ন্যায়নীতির ভিতর থেকে ধৈর্য সহকারে ওই সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করা এবং এ সমস্ত দুর্যোগ যদি কোনো অত্যাচারী লোকের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে তাদের ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে রুখে দাঁড়ানোর নামও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ।

অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন– যে সব লোক ওই সমস্ত বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর এই সমাধানের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়ে সৎ ও ন্যায়নীতির ভিতর থেকে জেহাদের মাধ্যমে ওই সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করে, আর ওই কথা বলে- আমরা আল্লাহরই সিদ্ধান্তের ওপর রাজি রয়েছি এবং তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে আমার বেহেশতের শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।

কোরআন শরিফের এই আয়াতের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিগত ২৫ মার্চ থেকে নরঘাতক জল্লাদ ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে যে গণহত্যা ও পাশবিকতা চালিয়েছে এবং এর মাধ্যমে এদেশের জনগণের ওপর যে ভয়াবহ ও দুর্বিষহ বিপদ নেমে এসেছে, এগুলোও মানুষের ওপর আল্লাহ্ তায়ালার বিরাট পরীক্ষা। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় অবশ্যই আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে। এবং সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে অসীম সহনশীলতা ও ধৈর্যের সঙ্গে জেহাদ করে যাওয়া। এই বিপদের দিনে অবশ্যই আমাদেরকে ন্যায়-নীতি মেনে চলতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উঠার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

অক্টোবর ১৯৭১

(আবু রাহাত মো. হাবিবুর রহমান রচিত।)[১০৩]

পাকিস্তানি সেনারাও মুসলমান, কিন্তু তাঁরা দোযখি, তারা যে অন্যায়-অত্যাচার ও গণহত্যা চালাচ্ছে, নারীদের লাঞ্ছনা করছে, তার ফলে তারা আল্লাহর ক্ষমা লাভের অনুপযুক্ত হয়েছে সেটাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে কথিকার তৃতীয়াংশে।

---

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮২-২৮৪

https://nagorikpathagar.org

॥ তৃতীয় ও শেষ অংশ ॥

'পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গি শাসকগোষ্ঠী বিগত ২৪ বছর যাবৎ শুধু বাংলাদেশের জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেই বঞ্চিত করেনি, ওপরন্তু এদেশের জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাদের ন্যায্য অধিকার চিরতরে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার হীনষড়যন্ত্রে মেতে উঠে বিগত ২৫ মার্চ থেকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। তারা হিংস্র পশুর ন্যায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, দোকান-পাট লুট করেছে ও জ্বালিয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, প্রায় এক কোটি লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে ও তিন কোটি লোককে নিজেদের ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে এবং বলপূর্বক এদেশের মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে ও তাদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। ওরা আমাদের সঙ্গে যে ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তা হচ্ছে ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ। কোরআনের দৃষ্টিতে ওরা শয়তানের বন্ধু এবং দোযখী। অতএব, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেছেন–

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ -

অর্থাৎ সুপরিকল্পিতভাবে যদি কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করে তবে এর একমাত্র বদলা হচ্ছে দোজখ।[১০৪]

এমনকি কোনো অমুসলমানকেও যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তবে তাঁর জন্যেও একই শাস্তির কথা হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে। দোযখীদের সাহায্য করাও দোজখের কাজের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আমার বান্দা যত বড় গোনাহ বা অন্যায়ই করুক না কেন, সে তার অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যদি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তা আমি মার্জনা করে দেবো। কিন্তু কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার নষ্ট করে, অন্যের অধিকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে অপরের মনে কষ্ট দেয় ও নারীর অমর্যাদা করে, সে আমার যত ইবাদত বন্দেগিই করুক না কেন আর যত ক্ষমাই চাক না কেন,

১০৪. সূরা নিসা : ৯৩

https://nagorikpathagar.org

তাকে ক্ষমা করার কোনো অধিকার আমার নেই। তাকে একমাত্র ক্ষমা সে-ই করতে পারে, যার সঙ্গে সে এহেন আচরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ ধরনের আচরণ করে যে ইহলীলা ত্যাগ করবে, সে সবচেয়ে নিম্নস্তরের হতভাগ্য ব্যক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের লোক হীনতর ইতর প্রাণী শূকর ও কুকুরের চেয়েও বেশি নিকৃষ্টতর।[১০৫]

যেমন, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কোরআনে বলেছেন–

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ-

সুতরাং চিন্তা করুন ওরা ইসলামের নাম ভাঙিয়ে বাংলাদেশে যেভাবে অন্যের অধিকার নষ্টের কাজে লিপ্ত রয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা কত বড় অপরাধী! নারীদের ওপর বলাৎকার করা ইসলামে কঠোর ভাষায় নিষেধ আছে। হুজুর ﷺ বলেছেন-

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ-

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি মুসলমান থাকা অবস্থায় কোনো নারীর সঙ্গে জেনা বা অবৈধভাবে পাশবিক লালসা চরিতার্থে মিলিত হতে পারে না।[১০৬] সুতরাং পাক হানাদার পশুরা যেভাবে বাংলাদেশে নারী ধর্ষণ চালাচ্ছে, তাদেরকে আমরা ইসলামের নামে সংহতির ধ্বজাধারী মুসলমান বলে মেনে নিতে পারি না। তারা হলো মুসলমান নামধারী বেঈমান ও মুনাফেক। অতএব, এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ও সার্বিক অসহযোগিতা প্রদান করে ওদের বেঈমানির সমুচিত জবাব দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যদি আমাদের এই দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করি, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে আমরাও ওদের সম-অপরাধী বলে গণ্য হবো। কারণ, ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে প্রতিটি বিশ্বমানবকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অর্থ শুধু অস্ত্রধারণ করে জেহাদই নয়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক সাহায্য প্রদান, অন্যায়কারী ও তাদের সহযোগীদের সঙ্গে সার্বিকভাবে অসহযোগিতা করা, এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারীদের নানাভাবে সাহায্য প্রদান করা, এর বিরুদ্ধে মানুষকে বুঝিয়ে গণসমর্থন গড়ে তোলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের বিজয়ের ওপর

১০৫. সূরা আ'রাফ : ১৭৯

১০৬. আবু দাউদ : ৪৬৮৯

https://nagorikpathagar.org

দৃঢ়বিশ্বাস ও আশা পোষণ করা এবং পুরোপুরি ধৈর্য সহকারে সৎ ও ন্যায়নীতির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উজ্জ্বল ও স্বর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখাও ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, হে বাঙালি ভাইবোনেরা! আসুন আমরা অন্যায়কারী পশ্চিমা হানাদার পশু ও এদের পদলেহী দালাল কুকুরদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে জেহাদ চালিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ-

(আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর রহমান রচিত)[১০৭]

রমজানের ঈদের স্মৃতি-আলেখ্য

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে রোজার ঈদ এসেছিল, সেই ঈদ উপলক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্মৃতি-আলেখ্য অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি বাহিনীকে এজিদের বাহিনী বলে অভিহিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতাকে সীমারের বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। এজিদের পিতা যেভাবে বর্শার আগায় কুরআন বিঁধে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছিল, ঠিক সেভাবে পাকিস্তানি শাসকেরা ইসলামকে ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে বলেও সেই অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, ইমাম হোসেনের সঙ্গে যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কতিপয় মুসলমান, ঠিক একইভাবে কিছু মুসলমান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ছত্রে ছত্রে ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে এই তুলনা এবং প্রতি-তুলনার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মভাব জারি ছিল, সেটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারা যায়। সেই অনুষ্ঠানটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো–

‘রমজানের ওই রোযার শেষে
এলো খুশির ঈদ।’

...2nd Voice (Female)

‘ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ,
এনেছে এজিদ বাংলার বুকে মহররমের চাঁদ।
এসেছে কাসেম এসেছে সখিনা সারা দেহে হায় তপ্ত খুন,

---

১০৭. *প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮২-৮৫*

https://nagorikpathagar.org

আজ নয় ঈদ, আজ কোটি মুখে ইন্নালিল্লা... রাজেউন।
ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ,
এনেছে এজিদ আবার এদেশে মহররমের চাঁদ।'

1st Voice (Male)

'শওয়ালের চাঁদ নয়, মহাররমের চাঁদ। না, তা কি করে হয়? রমজানের পর কি মহাররম না শওয়াল?'

2nd Voice (Female)

'শওয়াল। কিন্তু বাংলার আকাশে এখন রমজানের পর মহাররম। শওয়ালের চাঁদ পথ ভুলে গেছে। এজিদের তরবারির ভয়ে, বর্বরতার ভয়ে বঙ্গোপসাগরে উঁকি মারতে এসে সে পালিয়ে যায় তার সব আলো আর আনন্দ নিয়ে দূর আরবের মরু বিয়াবানে। এবার দামেস্কে নয়, ঢাকায় হয়েছে এজিদের অভ্যুদয়। আর সীমারের সেনারা ঘুরছে বাংলার পথে পথে। লুট করছে নারীর ইজ্জত, হত্যা করছে রোযাদার বাঙালিকে। এজিদের বাবা যেমন একদিন বর্শার আগায় পবিত্র কোরআন বেঁধে বিভ্রান্ত করেছিল আরবের মুসলমানদের, এ যুগের এজিদ ইয়াহিয়াও তেমনি ইসলাম আর কোরআনের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছে বাংলার মুসলমানকে।* সে যুগের এজিদ ছিল মুসলমান। এ যুগের ইয়াহিয়াও মুসলমান। এজিদ কারবালায় হত্যা করেছে দশ হাজার মুসলমানকে। আর ইয়াহিয়া বাংলাদেশে হত্যা করেছে কয়েক লাখ মুসলমানকে।'

1st Voice (Male)

'ঠিক। ঠিক। এজিদ বলেছিল, আরবের মুসলমানকে খেলাফত দেব না। আমি চাই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ইয়াহিয়া বলছে, বাংলার মুসলমানকে আমি গণতন্ত্র ও স্বাধিকার দেবো না। আমি চাই মিলিটারি ফ্যাসিজম কায়েম রাখতে। আলোচনার নামে এজিদের বন্ধু কুফার বিশ্বাসঘাতক মুসলমানেরা মহানবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কারবালায়। তার পিপাসার্ত স্ত্রী, পুত্র, শিশুকে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দেয়নি খেতে। এ যুগের ইয়াহিয়া আলোচনার নামে বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করেছে। আজ তিনি কোথায় কেউ জানে না। কেউ জানে না।'

---

* 'বইয়ের লেখক এখানে *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র* বই থেকে উদ্ধৃত মূল টেক্সটের কোনো পরিবর্তন করেননি। এই অংশটি যিনি লিখেছেন, হয়তো তিনি এজিদের বাবা মুয়াবিয়া رضي الله عنه-কে উপস্থাপনার সময়ে অসতর্কতার কারণে এভাবে তুলে ধরেছেন। ধর্মতাত্ত্বিকেরা এই ঘটনার ব্যাখ্যায় ভিন্নমত পোষণ করতেই পারেন—প্রকাশক।'

https://nagorikpathagar.org

1st Voice (Male)
'নবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কুফাবাসী বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন মুসলমান। বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুর মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাংলার কয়েকজন কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক মুসলমান। নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, কাসেম, সোলায়মান, খাজা খায়রুদ্দি, গোলাম আযম, মাহমুদ আলী গয়রহ। এদের চরম শাস্তির দিন আজ সমাগত। বাংলার বুক থেকে এই নামগুলোর অপবিত্র অস্তিত্ব মুছে দিতে হবে।'

2nd Voice (Female)
'আবার শয়তান সীমারের ছুরি উদ্যত হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীর বুকে। পবিত্র রমজান মাসে কারফিউ জারি করা হয়েছে ঢাকা শহরে। ঘরে ঘরে চলছে সার্চ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। শাওয়ালের চাঁদ, তুমি মুখ ঢাকো। তোমার আলোয় যারা মোনাজাতের হাত তুলবে পশ্চিমমুখী হয়ে পবিত্র কাবাঘরকে সাক্ষী রেখে, যারা জামাতে শামিল হয়ে করবে ইবাদত, তারা আজ কোথায়? তাদের কঙ্কালের স্তুপে, তুমি কিসের আলো ছড়াবে-আনন্দের? না শোকাশ্রুর?'

1st Voice (Male)
'না শোকাশ্রুর নয়, সংকল্পের। এবারের শাওয়ালের চাঁদ বাঁকা খঞ্জর হয়ে বাংলার মানুষকে পথ দেখিয়েছে। উঠুক মহররমের চাঁদ বাংলার আকাশে। আমরা কাঁদবো না। অশ্রু ফেলবো না। বাংলার তরুণের হাতে আজ অস্ত্র। ঈদের চাঁদের বাঁকা শরীরের মতো বাঁকা তলোয়ার। শত্রুনিপাতের সংকল্পে আজ ঐক্যবদ্ধ লক্ষ বাঙালি তরুণ। ওই দ্যাখো, সীমারের চোখে আজ ভয়। এজিদের চোখে ঘনায়মান পরাজয়ের আতঙ্ক।' [আবার গান][১০৮]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নানা ধরনের কৌতুকপূর্ণ নাটিকাও প্রচারিত হতো। সেই নাটিকাতেও বাঙালিরা চিত্রিত হতো ধর্মের পক্ষের মানুষ হিসেবে, আর পাকিস্তানিরা চিত্রিত হতো ধর্মের বিরুদ্ধের মানুষ হিসেবে। পাকিস্তানিদের মুখে সংলাপকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হতো, যেন তারা নাস্তিক। নিচের একটি নাটিকার অংশে আমরা সিপাহি বা পাকিস্তানি সেনা আর দুর্মুখ যে কিনা বাঙালি চিন্তার প্রতিভূ-তাদের সংলাপের কিয়দংশে সেই চিত্রই দেখতে পাব।

---

১০৮. *প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮৮-৯১*

https://nagorikpathagar.org

দুর্মুখ : না, মানে ইয়ে বলছিলাম কি, জনাবের বয়স অনেক হয়েছে, তাই জাহান্নামে যাবার পাসপোর্ট পেতে দেরি নয়। তবে হুজুর, বেহেশতে যাবেন না। ওখানে আপনি শান্তি পাবেন না। কারণ, সেখানে যতসব মহাত্ম ব্যক্তিরা খোদার ধ্যানে মগ্ন। ওসব ন্যাকামিপনা দেখলে আপনার গা খিসমিস করবে-হাত চুলকাবে। তার চাইতে আপনি দোযখবাসী হবেন। সেখানে আপনার অনেক বাপ, দাদা, চাচা, মামুর সাক্ষাৎ পাবেন। আপনি সেখানে গেলে একেবারে দোযখ গুলজার হবে। কবে যাবেন জাহাপনা? আগে থেকে জানাবেন যাতে ঢাকেশ্বরী মিলের ফাইন কাফনের কাপড় আপনার হাতে দিতে পারি। আমাদেরও তো একটু কর্তব্য আছে।

সিপাহি : খামোশ কমবখত।

দুর্মুখ : এই তো আবার চটে যাচ্ছেন। যত বুড়ো হচ্ছেন ততই মেজাজ খিটখিটে হচ্ছে। শিশু হত্যা নারী হত্যা করে আপনি যে রকম না করেছেন তাতে মেজাজের মুখে লাগাম না দিলে বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবেন।

সিপাহি : আমাকে মারবার সাধ্য কারও নেই।

দুর্মুখ : আছে জনাব, আছে। ওই মাথার ওপরে যিনি বসে আছেন, তার মার আপনি রকেট-বোমা দিয়েও ঠেকাতে পারবেন না। সেই মার দুনিয়ার বার।

সিপাহি : আমি কাউকে পরোয়া করি না দুর্মুখ।

দুর্মুখ : আপনি খোদাকে মানেন?

সিপাহি : যাকে দেখি না তাকে মানি না।

দুর্মুখ : তা হলে ইসলাম রক্ষার জন্য বাংলার বুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলেন কেন?

সিপাহি : মসনদ ক্ষমতা রক্ষাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।[১০৯]

---

১০৯. *প্রাগুক্ত*, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫৩-৫৪

https://nagorikpathagar.org

চৌদ্দো

মুক্তিযুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকায় ইসলাম প্রসঙ্গ

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাড়াও প্রবাসী সরকারের আরেকটি মিডিয়া ছিল, সেটা হচ্ছে *জয়বাংলা* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এক রঙে ছাপা পত্রিকাটি প্রত্যেক শুক্রবারে প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকায় রণাঙ্গনের খবর, প্রবাসী সরকারের ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক খবরাখবর, মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশবাসীদের জন্য উদ্দীপনামূলক খবর ছাপা হতো। সেই পত্রিকা পাঠ করলেও এটাও স্পষ্ট হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা ইসলামেই খোঁজা হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সেখানে অতি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। সেসব সংবাদ ও প্রতিবেদন থেকে আমরা নির্বাচিত কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব।[১১০]

১১০. *জয়বাংলা* পত্রিকার সংখ্যাগুলো হুবহু স্ক্যান করে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে ঢাকার ঐতিহ্য প্রকাশনী থেকে। এখানে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *জয়বাংলা* সংকলন থেকে গৃহীত।

https://nagorikpathagar.org

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোর কয়েকটি দিক

এক.

ইসলাম প্রসঙ্গ–

> 'জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম। আওয়ামী লীগ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট গ্যারান্টি থাকবে যে, পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহতে সন্নিবেশিত ইসলামের নির্দেশনাবলির পরিপন্থি কোনো আইন পাকিস্তানে প্রণয়ন বা বলবৎ করা চলবে না। শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি সন্নিবেশিত হবে। সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'[১১১]

এখানে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতেও ইসলামের পরিপন্থি কিছু নেই; বরং আওয়ামী লীগ ইসলামের হেফাজত করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দুই.

'রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বেঈমানদের ত্রাহি ত্রাহি রব!'- এটি ছিল *জয়বাংলা*-এর একটি সম্পাদকীয়ের শিরোনাম। 'বেঈমান' শব্দটির ধর্মগন্ধী ব্যবহার দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে শত্রুপক্ষের কোনো ঈমান নেই। ইসলামি ভোকাবুলারি এভাবে বেছে বেছে ব্যবহার লক্ষণীয়।[১১২]

তিন.

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে প্রবাসী সরকারের যে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তা দেশবাসী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এ রকম একটি সংবাদ–

---

[১১১]. *জয়বাংলা*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র, মুজিব নগর, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বুধবার ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮, ২রা জুন, ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ৪

[১১২]. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বুধবার ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, ২রা জুন ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ৭

https://nagorikpathagar.org

অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে জরুরি তারবার্তা

> 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের কাছে গত ২৫ জুন মুজিবনগর থেকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।
>
> জেদ্দায় আসন্ন বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলনের প্রাককালে এই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
>
> তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শতকরা ৮০ জন মুসলমান। ইয়াহিয়া সরকার জনগণের নির্বাচনের রায়কে অগ্রাহ্য করে বিশ্বাসঘাতকের মতো অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছে বলেই বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।
>
> অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, দশ লক্ষেরও বেশি লোককে তারা হত্যা করেছে। ৬০ লক্ষের বেশি লোক গৃহহারা হয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এবং এখনো হাজার হাজার লোক প্রতিদিন দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা মসজিদসমূহ ধ্বংস করেছে, মসজিদের ইমামদের এবং নামাযরত মুসলমানদের গুলি করে হত্যা করেছে। আর তারা এসব করেছে ইসলামের নামেই।'[১১৩]

তিনি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুরোধ করেছেন, যেন তাঁরা গণহত্যা বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ন্যায্য দাবির পক্ষে সম্মেলনে তাঁদের প্রভাব খাটান।

চার.

জয়বাংলা পত্রিকা আরেকটি খবর ছাপে 'আরব পাকিস্তানকে চাপ দেবে' শিরোনামে। এই খবরের লক্ষ্য ছিল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (১৯৭১ সালে এটাই ছিল মিশরের নাম) মুক্তিযুদ্ধকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছে এটা জানানো। খবরটি নিম্নরূপ–

---

১১৩. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, শুক্রবার ১৭ই আষাঢ় ১৩৭৮, ২রা জুলাই ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ১০।

https://nagorikpathagar.org

আরব পাকিস্তানকে চাপ দেবে

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার সাদাত গত ৩রা জুলাই নীলনদের বাঁধে ভারতীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব ফখরুদ্দিন আহমদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকালে তাঁকে জানান যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত শরণার্থীরা যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে, তার জন্য স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র পাক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জোর চেষ্টা জানাবেন।

বৈঠক শেষে ভারতীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব আহমদ সাংবাদিকদের জানান যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত বাংলাদেশ সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।[১১৪]

পাঁচ.

জয়বাংলা পত্রিকায় আরেকটি উপসম্পাদকীয় ছাপা হয় যার শিরোনাম ছিল– ‘পশ্চিম পাক দস্যুরা ইসলামের নামে এতকাল শোষণ করেছে’। রেটরিক্যালি লেখা। সেখানে একজন ধর্মপরায়ণ মায়ের প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার কাছে ফরিয়াদ জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে–ওরা যে ইসলামের কথা বলে, সেই ইসলাম কীভাবে এই জুলুমকে অনুমোদন দেয়? মাকে ছেলে বলছে, ‘তুমি তো ধর্মের কথা বলতে মা। ইয়াহিয়াও ধর্মের কথা বলছে। কিন্তু কী ভীষণ পার্থক্য! পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা ইসলাম ধর্মকে নিজেদের সেবাদাসী করে ফেলেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে সেই যে শোষণ শুরু হলো তার আর শেষ হলো না।’ ছেলে আরো বলছে, ‘ওরা কীভাবে ইসলাম ধর্মের সেবা করছে শোনো। মুসলমানরা নামায আদায় করে মসজিদে, সেই মসজিদ ওরা ভেঙে দিয়েছে বহু জায়গায়। একটি মসজিদে মুসলমানরা নামায পড়ছে, ওরা সেসব নামাজীকে হত্যা করলো।’

পুরো লেখাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

---

১১৪. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪শে আষাঢ় ১৩৭৮, ৯ই জুলাই ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ৯

https://nagorikpathagar.org

পশ্চিমা পাক দস্যুরা ইসলামের নামে এতকাল শোষণ করেছে

অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ

'আমার মাকে দেখেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছেন। আবার সংসারের কাজও করছেন। আল্লাহ্ মানুষের রুটি-রোজগার জোগান। কাজেই যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি আহার দেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রার্থনার মাধ্যমে অদ্যাবধি ধর্মভীরু মানুষ, তাঁর সমস্ত মানসিক সংকটের পরিত্রাণ খুঁজেছে। মাকে দেখেছি, ইসলামের বিধি-বিধান থেকে যাতে তার বিচ্যুতি না ঘটে, সে ব্যাপারে বড় সাবধানে থাকতেন। কিন্তু এও দেখেছি আশপাশের প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি সর্বদা বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতেন, গরিব-মজুরের দুঃখের দিনে তাদের যতটা পারতেন সাহায্য করতেন। রোগ-ব্যাধি হলে সকলের পাশে এসে দাঁড়াতেন। অন্যদিকে পাড়ার লোকেরাও মাকে সমীহ করে চলতেন, আপদে-বিপদে মায়ের পরামর্শ নিতেন। আরও দেখেছি, বাড়ির গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি সকলের প্রতি তাঁর একটা সহমর্মিতা ছিল। জন্তু জানোয়ারের প্রতি অযথা নিষ্ঠুরতা তিনি সইতে পারতেন না। গাছপালাও তার স্নেহাদর থেকে বাদ পড়েনি। কেউ রাতের বেলা গাছের ফল বা গাছের পাতা ছিঁড়লে তিনি ক্ষেপে যেতেন। বলতেন, সবারই বিশ্রাম নেবার সময় আছে, গাছপালা তরুলতারও আছে।

ধর্ম বলতে আমি আজও যেটুকু বুঝি, সেটুকু আমি শিখেছি আমার মায়ের কাছে। ধর্ম মানে যে শুধু আচার নয়, তার সঙ্গে হৃদয়ের গভীর আত্মীয়তা দরকার, সেই শিক্ষা মায়ের কাছে আমি পেয়েছিলাম। অন্য কোনো জাতির বিরুদ্ধে কখনো কথা বলতেন না- অন্য ধর্মের বিরুদ্ধেও বলতেন না। আমাকে বলেছিলেন, খোদা তো সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, সবাইকে তিনি আহার দিচ্ছেন। কে ভালো আর কে মন্দ, সে বিচার করবেন খোদা। কে পাপী আর কে পুণ্যবান, সেটাও তিনিই স্থির করবেন। কাজেই খোদার সৃষ্ট জীব হয়ে, অন্যান্য সৃষ্ট জীবের বিচার করবার অধিকার আমার নেই। দেখো না, খোদা সকলেরই অন্ন দিচ্ছেন- কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী, তা দেখে তো তিনি অন্ন দেন না। আল্লাহর দেওয়া আলো হাওয়া শুধু পুণ্যবানই ভোগ করবে এমন তো নয় বাবা।

https://nagorikpathagar.org

পাপী-তাপীরাও তা সমানভাবে পায়। যদি আল্লাহ্ স্বয়ং পাপী-তাপী-বিধর্মী সবাইকে তাঁর স্নেহাদর দিতে পারেন সমানভাবে, তাহলে আমার কী ক্ষমতা যে আমি সবকিছুর বিচার করি। মা যেভাবে বলতেন, সেভাবে আমি বলতে পারি না। শুধু অনুভব করতাম, কথা বলবার সময় মায়ের চোখে মুখে বিশ্বাসের আলো কমনীয় হয়ে ফুটে উঠত।

হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়েছিল। মায়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি। আর কি দেখা হবে? হয়তো হবে না। ইয়াহিয়ার খুনি সেনারা দশ লক্ষ খুন করেছে। আরও দশ লক্ষ করবে প্রয়োজনবোধে। মাগো, তোমার সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়, ক্ষমা করো আমাকে, ক্ষমা করো তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তানকে। মাগো, শুধু আমি একা নই, তোমারই মতো স্নেহপরায়ণা মায়ের কতো সন্তান নিখোঁজ হয়েছে। কতো যুবক ইয়াহিয়ার জল্লাদ সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছে। আর মাগো, তুমি কেঁদো না। মনে করো, এই আমার চিঠি। ঠিকানাবিহীন চিঠি। আজ যা বলছি- তা বলছি, তোমাকে লেখা আমার চিঠি থেকে।

তুমি তো ধর্মের কথা বলতে মা। ইয়াহিয়াও ধর্মের কথা বলছে। কিন্তু কী ভীষণ পার্থক্য! পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা ইসলাম ধর্মকে নিজেদের সেবাদাসী করে ফেলেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে সেই যে শোষণ শুরু হলো, তার আর শেষ হলো না। তোমার তো মনে আছে মা, ১৯৫৪ সালে এক মণ ধান বেচে তুমি আমাকে এক দিস্তা কাগজ কিনে দিয়েছিলে। কারণটা তোমার জানা ছিল না। চন্দ্রঘোনা পেপার মিলের কাগজ প্রথমে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে, তারপর ফিরে আসত ঢাকায় বিক্রির জন্য। কাগজের এজেন্টরা ছিল সবাই পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি। তামাক চাষের কথা তো তুমিও জানো মা। কী হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তামাক আমরা উৎপন্ন করতাম। অথচ আমরা তার দাম পেতাম না। যে মুহূর্তে তামাক পুঁজিপতির ঘরে যেত, অমনি তার দাম বেড়ে যেত। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এভাবেই ধর্মের নামে ইসলামের নামে আমাদের শোষণ করেছে। বলেছে, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। কিন্তু আজ তো দেখছ মা, আমরা সব ঠাঁই ঠাঁই। ধর্মের নামে শোষণ বেশিদিন চললো না। বাংলার সন্তানেরা সব বুঝে ফেললো। তাই তারা রচনা করলেন বিপ্লবের পথ, মুক্তির পথ।

https://nagorikpathagar.org

মার্চ মাস থেকে শুরু হলো বিপ্লবের জয়যাত্রা। বাঙলার অগ্নিসন্তানেরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। ইয়াহিয়ার জল্লাদ সেনাবাহিনীও ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওরা কী বলে জানো মা, ওরা নাকি ইসলাম ধর্মকে বাঁচাতে এসেছে। বাঙালি জাতটা নাকি উচ্ছন্নে গেছে, তাই তাদের শায়েস্তা করা দরকার। কিন্তু অবাক লাগে যখন ওরা শোষণ করে। ওদেরকে যদি বলা যায়, তোমরা যদি এতই মুসলমান হয়ে থাক তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে এভাবে শোষণ করো কেন? কেন হিন্দু মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করো। কেন বাঙালি-অবাঙালির মধ্যে দাঙ্গা বাঁধাও? কিন্তু না ওরা এসব প্রশ্নের জবাব দেয় না। কেননা, জবাব দেবার কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা ইসলামের কথা বলে। কারণ, ওরা সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করতে চায়। ওরা শোষণ আর অত্যাচারের কাহিনী গোপন করার জন্য ইসলামের কথা বলে। আর এখন এই মুহূর্তে, ইসলামের নামেই তারা বাঙালি মায়ের সন্তানকে হত্যা করছে। সে হত্যা, খুন, ধর্ষণ, অত্যাচারের কাহিনী শুনবে মা। অবশ্য তুমি তো চোখের সামনেই সব দেখছো। তবু বলি মা শোনো।

ওরা কীভাবে ইসলাম ধর্মের সেবা করছে শোনো। মুসলমানরা নামায আদায় করে মসজিদে, সেই মসজিদ ওরা ভেঙে দিয়েছে বহু জায়গায়। একটি মসজিদে মুসলমানরা নামায পড়ছে- ওরা সেসব নামাজীদেরকে হত্যা করল। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ছিল বহু পুরানো কালীবাড়ি, তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের বিহার ও মন্দির ওরা তছনছ করে দিয়েছে। খ্রিস্টানদের গির্জা বাড়ি ও স্কুলঘর ওরা ধ্বংস করেছে। সত্যি মা এমনভাবে ইসলাম ধর্মের সেবা কেউ কখনো করেনি। সব ধর্মের প্রতি ওরা সমান উদার। কাউকে ওরা রেহাই দেয় না। দশ লক্ষ বাঙালিকে ওরা শুধু হত্যাই করেনি, মুসলমান-হিন্দু-খ্রিস্টান সবার মৃতদেহ ওরা শেয়াল-কুকুর, শকুনি-গৃধিনী দিয়ে খাইয়েছে। আজও রাস্তায় রাস্তায় নর-কঙ্কাল পড়ে আছে। নদীতে নদীতে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহ। সেদিন এক জায়গায় দেখছি, একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। দুটি কাক মৃতদেহের চোখ দুটি উপড়ে নিচ্ছে। মাগো, আমার কী মনে হয় জানো, ওগুলো কাক নয়- ওগুলো পশ্চিম পাকিস্তানি খুনি জল্লাদদের প্রেতাত্মা।

কী অত্যাচার মা! তোমার পেটের সন্তান আমি- অথচ ধরো তোমার চোখের সামনেই আমাকে যদি ওরা খুন করে। মা তুমি সহ্য করতে পারবে?

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু খুন তো সামান্য কথা। আমার মা-বোনকে ওরা কীভাবে ধর্ষণ করছে, তা ভাবা যায় না। মা-বাপের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করছে ইয়াহিয়ার সেনারা। কিন্তু তাতেও যখন সুখ হলো না, তখন বেয়নেট দিয়ে আমার বোনদের হত্যা করে। সন্তানের একমাত্র আশ্রয়, মায়ের স্তনকে ওরা কেটে ফেলে দিয়েছে। হাজার হাজার মা-বোনকে ধরে নিয়ে গিয়ে সামরিক ছাউনিতে রেখেছে- তাতেও সাধ মেটেনি। আজ তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের সেবাদাসী করবার জন্যে মাগো, এভাবেই ওরা ইসলাম ধর্মের সেবা করছে।

মাগো! ভেবে পাই না, তুমি যে আল্লাহকে ডাকো, তার রুদ্র রোষ কেন এদেরকে আঘাত হানে না। কেন ধরণী দ্বিধা হয় না, কেন আকাশ ভেঙে পড়ে না মাথায়, কেন বজ্র এসে এদেরকে ধ্বংস করে না।

মাগো! আমরা বুঝেছি, এমনি কিছু হবে না। তাই মা মুক্তিবাহিনীর হয়ে লড়াই করছি। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। যদি আর দেখা না হয় মা, তুমি জেনে রেখো, তোমার সন্তান দেশের জন্য লড়ছে। মা, আমারই মতো তোমার এক ছেলে কবিতা লিখে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তার কবিতা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি–

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, বুঝি আরো দিতে হবে
এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে।
তবুও আজকে ভরসা, যেহেতু তোমরা রয়েছ পাশে,
তোমরা রয়েছ এদেশের নিশ্বাসে।
তোমরা রয়েছ, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার,
পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার।
আবার জ্বালাবো বাতি,
হাজার সেলাম তাই নাও আজ, শেষ যুদ্ধের সাথী।
তাই এসো চেয়ে দেখি পৃথ্বী-
কোনখানে ভাঙে আর কোনখানে পড়ে তার ভিত্তি।
কোনখানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব;
কোনখানে দানবের মরণ-যজ্ঞ চলে নিত্য;
পণ কর দৈত্যের সঙ্গে

https://nagorikpathagar.org

হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে;
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির
আজকে শপথ কর সকলে
বাঁচাব আমার দেশ, যাবে না তা শত্রুর দখলে;
তাই আজ ফেলে দিয়ে তুলি আর লেখনী
একতাবদ্ধ হও এখুনি।'[১১৫]

ছয়.
ইন্দোনেশিয়ার *জাকার্তা টাইমস*-এর বরাতে একটি খবর জয়বাংলা পত্রিকায় ছাপা হয়। সেখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়, 'যখন মুসলমানরা সহস্র সহস্র মুসলমানকে হত্যা করছে তখন ইসলাম কী জীবিত থাকতে পারে?' এই কথাটাকেই প্রশ্ন আকারে তোলা হয় মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি। প্রকারান্তরে এটাই বলার চেষ্টা করা হয়, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানদের হত্যা করছে ফলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ইসলামের পক্ষে থাকার দাবি মিথ্যা। পুরো খবরটি দেখুন–

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি একটি জিজ্ঞাসা

'ইন্দোনেশিয়ার *জাকার্তা টাইমস*'-এ পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়, 'যখন মুসলমানরা সহস্র সহস্র মুসলমানকে হত্যা করছে, তখন ইসলাম কী জীবিত থাকতে পারে?' বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আজ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

পত্রিকায় বলা হয়, শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান যদি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয় (সমস্ত পৃথিবীই জানে যে, এটা হতে বাধ্য) তা হলে বর্তমান সংকটকাল অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য এটা কী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না? যদি ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলাদেশ মনে করে যে, মুসলিম জগৎ নিপীড়িতদের

---

১১৫. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, শুক্রবার ৩১ আষাঢ় ১৩৭৮, ১৬ জুলাই ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ৩-৪।

https://nagorikpathagar.org

সমর্থন না করে ক্ষমতাবান, নিপীড়ক ও শোষকদের সমর্থন জুগিয়ে এসেছে, সেদিন কী মুসলিম জগৎ দুর্বল হয়ে পড়বে না? ইসলামের জন্য এটা হবে একটি বিরাট আঘাত।'[১১৬]

সাত.

জয়বাংলা পত্রিকায় পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ-এর বরাতে জানানো হয়, তিনি আরব দেশসমূহে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারে লিপ্ত ছিলেন এবং সেই প্রচারে আরব জাহান বিভ্রান্ত ছিল। 'পূর্ব পাকিস্তানে' মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; এই সংবাদেই আরব জাহানের সাধারণ নর-নারী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি প্রোপাগান্ডায় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন বলে জানানো হচ্ছে। এই সংবাদে অবরুদ্ধ দেশবাসীকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে, এই ন্যায়সংগত লড়াইয়ে আরব এবং মুসলিম বিশ্ব নৈতিকভাবে আমাদের পক্ষে আছে। পুরো খবরটি–

বিশ্ব জনমত : আরব জাহানে জঙ্গি চক্রের মিথ্যা প্রচারণার গোমর ফাঁস

'বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনে বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশে জনমত প্রবল হয়ে উঠছে, আরব জাহানও এর ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য "পাকিস্তানি" এম্বেসি এবং বেতার ও টেলিভিশনের জঘন্য ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশ সম্বন্ধে সত্য খবর থেকে বঞ্চিত ছিল।

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা, পাইকারি লুণ্ঠন, নজিরবিহীন নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, ভারী ট্যাঙ্ক ও উড়োজাহাজ ব্যবহার, নাপাম বোমা প্রয়োগ এবং প্রায় এক কোটি বাঙালিকে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেও জল্লাদ ইয়াহিয়া বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম স্তব্ধ করে দিতে তো পারেইনি বরং দিন দিন জোরদার হচ্ছে, শত চেষ্টা করেও জঙ্গি ইয়াহিয়া সরকার আরব জাহানে এই সব সংবাদ গোপন রাখতে পারেনি।

"পূর্ব পাকিস্তানে" মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এ সংবাদেই আরব জাহানের সাধারণ নর-নারী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি

---

১১৬. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা, শুক্রবার ১৭ ভাদ্র ১৩৭৮, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ১০।

https://nagorikpathagar.org

প্রোপাগাণ্ডায় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকে নিযুক্ত সাবেক পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ সম্প্রতি লন্ডনের এক সাংবাদিকের কাছে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, খামাখা বাংলাদেশ-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী প্রচার কার্য চালিয়ে তিনি হয়রান হয়ে পড়েছিলেন। রাওয়ালপিন্ডির নির্দেশে পাকিস্তানের এক নম্বর দুশমন হিসেবে ভারতকে এবং দুই নম্বর দুশমন হিসেবে বাংলাদেশকে আরব জাহানের নর-নারীর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি সর্বদা প্রচারিত হয়েছে যে, 'বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সব সময়ই রাজি আছেন।' জনাব ফতেহ বলেন যে, অধিকাংশ আরব নেতা অবশ্য মনে করেন ইয়াহিয়া খানের মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলাপ না করে বরং নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা উচিত।

আরব জাহানের সমর্থন লাভের প্রত্যাশায়, ভারত ও বাংলাদেশ বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য 'পাকিস্তান সরকার' বিভিন্ন পুস্তিকা ও ইস্তাহার গোপনে বিলি করেছে। এর মধ্যে একটি হলো, 'ভারতে অবস্থানরত ইসরাইলিদের উসকানির দরুন বাংলাদেশ আন্দোলন।'

আরব জাহানে পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা অপপ্রচার অব্যাহত থাকলেও জনাব ফতেহ মনে করেন, আরব জাহানে এই প্রচার অবশ্যই ব্যর্থ হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আরবরা জাতি হিসেবে অভিন্ন ও এক হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরববাসীরা নিজেদের প্রয়োজনেই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছেন। সেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে জাতি হিসেবে বাংলাদেশ আলাদা। অতএব, একমাত্র ধর্মীয় সংযোগের সূত্র ধরে এক হাজার মাইল ব্যবধানের দূরত্বে অবস্থিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে কোনো যুক্তিই আজ আর আরব জাহানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতা এবং ব্যাপক গণহত্যা পাকিস্তানকে সমর্থনের ব্যাপারে আরব জাহানের নৈতিক অন্তরায়।

https://nagorikpathagar.org

জঙ্গি নেতা ইয়াহিয়া খান অনর্গল বানোয়াট মিথ্যা প্রচার করে, সত্য গোপন করে আরব জাহানের কোটি কোটি নর-নারীর শুভ বুদ্ধি, কল্যাণ বুদ্ধি এবং জাগ্রত বিবেককে আর ধোঁকা দিতে পারছে না। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষে, সংগ্রামী বাংলাদেশের সমর্থনে আরব জাহানে দিন দিন জনমত গড়ে উঠছে।'[১১৭]

আট.

কয়েকটি আরব দেশ কূটনৈতিক পথে পাকিস্তানকে বোঝাবার ও প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে এমন খবর প্রচারিত হয়েছে *জয়বাংলা* পত্রিকায়। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ইসলামি বিশ্ব নেই; বরং পাকিস্তানের ওপরেই ইসলামি বিশ্ব বাংলাদেশের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন—সেই বিষয়টা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মিশরের আধা সরকারি পত্রিকা *আল আহরাম*-এর সিনিয়র সম্পাদক ড. মকসুদ এবং আরব থেকে আসা চার সাংবাদিকের বয়ানে নিম্নরূপ দুটি সংবাদ এতে ছাপা হয়।

'মিসরের আধা সরকারি পত্রিকা *আল আহরাম*-এর সিনিয়র সম্পাদক ড. মকসুদ বলেছেন, কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের নেতারা নীরব কূটনৈতিক পন্থায় ইয়াহিয়াকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করবার জন্য ইয়াহিয়াকে ব্যক্তিগত পত্র লিখেছেন।

ড. মকসুদ বলেছেন, অধিকাংশ আরব মনে করেন, বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে জাতিগত বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। এই জাতি বিদ্বেষমূলক মনোভাবের জন্যই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি। ড. মকসুদ আরো বলেন, বাংলাদেশ সমস্যাকে পাক ভারত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তিনি বলেন, আরবরা একটি দেশের ঐক্যে বিশ্বাস করে। কিন্তু দেশের ঐক্যের চাইতে একটি দেশের জনসাধারণের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ ঐক্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ঐক্য গড়ে উঠবার জন্য প্রয়োজন একটা দেশের সকল অংশের মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা। সমান অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস না করতে পারলে একটি দেশে ঐক্য থাকতে পারে না।

---

১১৭. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ১৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ ভাদ্র, ১৩৭৮, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ৪

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা মানব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ বিয়োগান্তক ঘটনা।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে আকাশবাণীর সংবাদদাতার সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. মকসুদ ওইসব মন্তব্য করেন। এ ছাড়া চারজন আরব সাংবাদিক নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে প্রদত্ত একটি স্মারকলিপিতে বলেছেন, "১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান হওয়া উচিত।"

এই চারজন সাংবাদিক হলেন- সুদানের আলী, সালেহ লেবাননের হাননান, মিসরের ডক্টর মকসুদ ও লিবিয়ার সিয়ালা।'[১১৮]

নয়.

জয়বাংলা পত্রিকায় ৫ নভেম্বর খুব চমকপ্রদ একটা শিরোনাম দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে 'শয়তানের মুখে খোদার নাম'। শিরোনামটা অভিনব। কারণ, এই শিরোনামটি নেওয়া হয়েছে 'ভূতের মুখে রাম নাম' থেকে। সেখানে ভূতের জায়গায় শয়তান বসিয়ে পাকিস্তানকে বোঝানো হচ্ছে এবং রামের জায়গায় খোদা বসানো হয়েছে। ভূতের মুখে রাম নাম খুব প্রচলিত বাগধারা, এটা স্কুলপাঠ্য বইয়েও রয়েছে। কিন্তু সম্পাদক সেই বহুল প্রচলিত বাগধারাও শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করতে চাননি। সম্পাদকের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, শব্দ ব্যবহারে ইসলামি অনুষঙ্গে থাকতে চেয়েছেন।[১১৯]

দশ.

তেহরান থেকে প্রকাশিত পত্রিকার খবর গুরুত্ব সহকারে *জয়বাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে–শেখ মুজিবের মুক্তিদান বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের প্রথম সোপান। এই খবরের মাধ্যমে এই বার্তাই দেওয়া হচ্ছে যে, ইসলামি দুনিয়া বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক।

---

১১৮. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ আশ্বিন, ১৩৭৮, ৪ অক্টোবর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ২, ৭

১১৯. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ২৬শ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ কার্তিক, ১৩৭৮, ৫ নভেম্বর, ১৯৭১, : পৃষ্ঠা ২

https://nagorikpathagar.org

মুজিবকে জেলে রেখে কোনো সমাধানই সম্ভব নয়

'ইরানের রাজধানী তেহেরান থেকে প্রকাশিত *সাদে মারদম* পত্রিকায় দাবি করা হয়েছে, শেখ মুজিবকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। শেখ মুজিবকে মুক্তিদান বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের প্রথম সোপান। তাকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে বাংলাদেশ সমস্যার কোনো সমাধানের কথা উঠতেই পারে না। পত্রিকাটিতে আরো বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিলে কেবল পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে না, এর ফলে যুদ্ধ উত্তেজনাও হ্রাস পাবে। পত্রিকাটির মতে, শেখ মুজিবের মুক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ সমর্থন করবে।

সামরিক অভিযান বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। সামরিক অভিযানের ফলে কোনো লক্ষ্যও সিদ্ধ হয়নি। এখন সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১২০]

এগারো.

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ৩ ডিসেম্বর ছিল ঈদুল ফিতর। এই দিন মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সেই জামাতের ছবিও প্রকাশ করে *জয়বাংলা* পত্রিকা। সেই জামাতে তাজউদ্দীন ও ওসমানীসহ বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাও অংশ নেন। এই খবর প্রকাশে এই বার্তাই দেওয়া হয়, 'প্রবাসী সরকার ইসলাম ধর্মীয় উৎসব এই ক্রান্তিকালেও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন।' সেই ছবির সঙ্গে বর্ণনা দেওয়া হয় এভাবে–

'বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামায অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী ও সদর দফতরের অন্যান্য কর্মকর্তারা ঈদের জামাতে অংশ নেন। জামাতে নামায শেষে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য, বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘায়ু কামনা, যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করছেন।'[১২১]

---

[১২০]. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ২৮শ সংখ্যা, শুক্রবার, ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ৯

[১২১]. *প্রাগুক্ত*, ১ম বর্ষ ৩০শ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা : ২

https://nagorikpathagar.org

পনেরো
উপসংহার

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। এই মুসলমানরাও যে বাঙালি, এর স্বীকৃতি তাদের নিজের রক্ত দিয়ে আদায় করে নিতে হয়েছে। বাঙালি-মুসলমানদের বাঙালি বলে স্বীকার করা হতো না। পশ্চিম বাংলার যে 'বাঙালি প্রজেক্ট', তা আবর্তিত হয়েছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দু সংস্কৃতিকে ঘিরে। সেই বাঙালি প্রজেক্টে বাঙালি-মুসলমানের সাধারণ জীবন ও সংস্কৃতি স্থান পায়নি। বাঙালি-মুসলমানরা নিজেদের বাঙালি বলে গণ্য করলেও তার কোনো রাজনৈতিক স্বীকৃতি ছিল না। যে পাকিস্তান হাসিলের জন্য সে লড়াই করেছে, তাতে মুসলমান নাম নিয়ে জমিদারি উচ্ছেদ ও জমি পাওয়ার সে-লড়াই লড়তে যাওয়ার কারণ, সেই পাকিস্তানে ধর্ম তার এক আত্মপরিচয় হিসেবে হাজির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু সংশোধন তখনও বাকি ছিল, বিশেষ করে জমিদারের 'জমিদার বাঙালি প্রজেক্টে' মুসলমানদের বহিরাগত করে রেখে দেওয়ার বিষয়টা। সে সুযোগ অচিরেই এসে যায়। তাই তাকে রক্ত দিয়ে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নিজের অধিকার পুনর্দাবি করে কায়েম করতে হয়েছে, নতুন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজের আবির্ভাব ঘটাতে হয়েছে বাংলাদেশকে।

এ ঘটনা শুধু বাঙালির ইতিহাসের জন্য নয়, মুসলমান বা ইসলামের ইতিহাসের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নিজেদের অধিকার কায়েম করতে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করেননি, ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর তাদের হক তারা বিসর্জন দেননি।

https://nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের পরতে পরতে থাকা ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান—যা আমরা এখানে আলোচনা করলাম, সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধ শুধু স্বাধিকারের লড়াই ছিল না, একটা নতুন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে ইসলামকে অবলম্বন করে তার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় গড়ে তোলারও সংগ্রাম ছিল। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর রক্ত দিয়ে নিজের অধিকার কায়েম করে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হয়নি। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কোনো বিরোধ নেই—এই সত্যটাই রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশের জনগণের এই অর্জন মহামূল্যবান।

আজ ইসলাম প্রশ্ন বাংলাদেশিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর মীমাংসার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ পরিচয় আর পথ চলা নির্ধারিত হবে।

সীমান্তের ওপারে পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের এভাবে রক্ত দিয়ে, ধ্বংস আর নির্মাণের কঠিন পথ ধরে নিজেদের বাঙালি প্রমাণ করতে হয়নি। যেহেতু জমিদারি আমলের 'বাঙালি প্রজেক্টে' বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দু সংস্কৃতির আরেক নাম, তাই সেকালে পশ্চিম বাংলায় 'হিন্দু মানে বাঙালি আর বাঙালি মানে হিন্দু হওয়া' সমার্থক হয়ে ছিল। এই জন্য 'বাঙালি প্রজেক্ট' গড়তে কোনো আলাদা সংগ্রাম তাকে করতে হয়নি। পাকিস্তানের মধ্যে থাকার পরও আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, আমরা ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়টা কীভাবে করব?

দুর্ভাগ্য, ৭১-এর পরে বাংলাদেশের উদয় যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারত, তাকে বাস্তবায়িত হতে না দিয়ে বাংলাদেশের বাঙালি পরিচয়ের সঙ্গে ইসলামের একটা কৃত্রিম বিরোধ নতুন করে জন্ম দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, বাঙালি ধারণার মধ্যে ইসলাম নেই, ইসলাম এক্সক্লুডেড। মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেটিভের মধ্য থেকে ইসলাম উধাও হয়ে গেছে এবং যে ইসলামের হাত ধরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নতুন ইতিহাস তৈরি হতে পারত, সেই ইতিহাসকে জন্ম নিতে দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের তিন নীতি—সাম্য, মানবিক মর্যাদা আর সামাজিক ন্যায়বিচারের বদলে চাপিয়ে দেওয়া দলীয় চার নীতি—ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিয়েই শুরু হয়েছিল সেই সম্ভাবনাকে ব্যাহত করার কাজটা।

https://nagorikpathagar.org

ষোলো

পরিশিষ্ট

মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম : প্রসঙ্গ কথা

গৌতম দাস

মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলাম প্রসঙ্গে অনেকে, বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী কিছু সেক্যুলার দাবি করে থাকেন যে, একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে 'ইসলামের পরাজয়' ঘটে গেছে। কিন্তু সেটা আদৌ কীভাবে অথবা কী অর্থে, মানে কেমন করে? এ সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা-বয়ানে ইসলাম বিদ্বেষ

এ প্রশ্নে স্পষ্ট সাফাই বা যুক্তিসিদ্ধ কোনো বক্তব্যের চেয়ে এরা সাধারণত আকার-ইঙ্গিতে কথা বলে থাকে। সেসব কথার সার বের করে আনলে যা পাওয়া যায় তা হলো—মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ ইসলামি দলগুলো পাকিস্তান সামরিক সরকারের পক্ষে সমর্থন ও অবস্থান নিয়েছিল। আর যেহেতু তাদের এ কাজের সপক্ষে তারা অজুহাত হিসেবে ইসলামকে খাড়া করেছিল, 'ইসলামকে রক্ষার জন্যই তাদের ওই অবস্থান'—এমন যুক্তি তুলেছিল। অতএব, এ কারণে মুক্তিযুদ্ধে তাদের পরাজয়, মানে একই সঙ্গে এটা ইসলামেরও পরাজয়। সন্দেহ নেই, এটা খুবই দুর্বল যুক্তি। আসলে বলা ভালো, এখানে কোনো যুক্তি-কাঠামোই তৈরি হয়নি।

https://nagorikpathagar.org

হাস্যরসের ছলে কাউকে হেয় করার জন্য যুক্তিপূর্ণ না হলেও আড্ডার আসরে আমরা অনেক সময় অনানুষ্ঠানিক অনেক কথা বলি। স্বভাবতই সেগুলো কোনো সিরিয়াস কথা নয়। এগুলো সে ধরনেরই বয়ানের নামান্তর। ব্যাপারটি হলো—যদি কেউ তার কাজ, অবস্থানের পক্ষে কমিউনিজমকে সাফাই হিসেবে আনে, তাতে সে কাজ কমিউনিজমসম্মত হয়ে যায় না বা তা নিশ্চিতও করে না। আমরা তা ধরেও নিতে পারি না। তেমনি কারও কাজ ও তার অবস্থানের পক্ষে ইসলামের সাফাই আনা মানেই সে কাজটা ইসলামসম্মত হিসেবে নিশ্চিত করে না। এমন বলার কারণেই তা সত্য হয়ে যায় না। শুধু দাবির কারণে আমরা তা সত্যি ধরে নিতে পারি না। ইসলাম অথবা কোনো কিছুকে সাফাই হিসেবে কেউ ব্যবহার করলেই সেটা আপনাতেই ওই আইডিয়ার (ইসলামের) সমস্যা হয়ে যায় না। অথবা তা ওই আইডিয়ার পরাজয় অথবা খামতি নির্দেশ করে না। এ ছাড়া মজলুমের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন করা সত্ত্বেও নিপীড়ক জালিমকেই আমরা কখনো কখনো তার কাজের সপক্ষে ইসলামের নামে সাফাই দিতেও তো দেখি, তাই না? কিন্তু তাই বলে তো সে দোষ ইসলামের নয়। ফলে সারকথায় বলা যায়—কারও নিজের কাজ বা তৎপরতার সপক্ষে ইসলামের দোহাই দেওয়ার সঙ্গে ওই কাজ ইসলামের কাজ হয়ে উঠার কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই।

এরপরও অনেকে আরেকভাবে যুক্তি তোলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের পরে যে রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল, অর্থাৎ ১৯৭২ সালে যে কনস্টিটিউশন রচনা করা হয়েছিল, সেখানে যেহেতু 'ধর্মনিরপেক্ষ' বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছিল, অতএব মুক্তিযুদ্ধে 'ইসলামের পরাজয়' ঘটে গিয়েছিল। নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, এই দাবিও ভিত্তিহীন, যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত দাবি নয়। কনস্টিটিউশনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বৈশিষ্ট্য এঁকে দেওয়াকে কারণ বা মূল যুক্তি হিসেবে যদি দেখানো হয় এবং তাতে যদি কোনো পরাজয় কিছুর হয়েই থাকে, তা হলে সে পরাজয় হয়েছে সাধারণভাবে ধর্মের। সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামের কোনো পরাজয় হয়নি। আবার সাধারণভাবে এখনও বাস্তবতা হলো—'ধর্মনিরপেক্ষ' দাবির পরে, না শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে, না পরবর্তী সময়ে, এমনকী এখনও রাষ্ট্রীয় আচারে ইসলামের প্রভাব কমেনি; রয়েই গেছে। খুব বেশি কোনো হেরফের হয়নি। শুধু তা-ই না, 'ধর্মনিরপেক্ষ' বৈশিষ্ট্যের কথা বলাতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মের কোনো বিচ্ছেদ, ত্যাগ বা বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কিছুই হয়ে যায়নি। আসলে এই অপ্রতিষ্ঠিত যুক্তি যারা এনেছে, এরা মূলত ইসলামবিদ্বেষী।

https://nagorikpathagar.org

তবু এখানে নোক্তা হিসেবে দুটো বাক্য বলে রাখা দরকার, তা হলো— কনস্টিটিউশনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ ঢুকে পড়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ আমরা বাংলাদেশের ভেতরের কেউ নই। আমাদের কারও চিন্তা বা দাবি থেকে এটা আসেনি। আমাদের রাজনৈতিক মাঠ থেকেও এ দাবি উঠে আসেনি। বাংলাদেশের ভেতরের কোনো ব্যক্তি, কোনো সংগঠন, ধর্মীয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান–কেউ এই (ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্র) দাবি করেনি; বরং এটা এসেছে বাইরে থেকে। সুনির্দিষ্ট করে বললে, এটা ছিল ভারতের দাবি; যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালে কূটনৈতিক সমর্থন ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে ভারতের শর্ত ও পরামর্শ হিসেবে এসেছিল।

তাই এখানে বরং প্রসঙ্গটা অন্য একদিক থেকে আলোচনা করা যাক। আমরা জানব, কেন বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) অভ্যন্তরীণ ইস্যু হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র রাজনৈতিক দাবি কখনো আসেনি, কখনোই আসতে পারে না। ষাটের দশকজুড়ে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের সময়ে আওয়ামী লীগের অবস্থান হিসেবে শেখ মুজিবের মুখ থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র দাবি অথবা 'রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা করতে হবে'—এই টাইপের এমন কোনো বয়ান আসেনি। মূলত এমন কথা আসা এককথায় সম্ভবই ছিল না। কিন্তু কেন?

পাকিস্তান থেকে আমাদের আলাদা হওয়ার আন্দোলন—যেটা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, যার আর এক নাম বলা যায় 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন। পুরো ষাটের দশকের সময়কালটা হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এই রাজনীতির ক্রমশ তুঙ্গে ওঠা ও নির্দিষ্ট আকার নেওয়ার সময়। এই সময়কালে, এই আন্দোলনে কখনো 'ধর্মনিরপেক্ষতা' অথবা রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা (সাধারণভাবে ধর্ম অথবা সুনির্দিষ্ট করে ইসলাম এ দুইয়ের যেকোনোটা অর্থে) করতে হবে বলে কোনো দাবি কখনো ওঠেনি। উঠার কোনো কারণও ছিল না। কারণ, এমন দাবি তুললে তা ওই আন্দোলনের বিরোধী ও শত্রুদেরই সাহায্য করা হতো। কীভাবে?

ধর্মীয় পরিচয়, ইসলাম ও জাতি রাষ্ট্র তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা

শুরুতেই কিছু ভুল অনুমান ভেঙে নেওয়া যাক। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১—এই সময়কালের পূর্ব পাকিস্তানে আমরা কেমন ছিলাম? এখনও বাংলাদেশে যাদের বয়স ৪৭ বছরের বেশি—এমন প্রজন্ম, তাদের সবার জন্ম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

https://nagorikpathagar.org

কথাটা বলছি এজন্য যে, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর এর আগের পাকিস্তান কী ছিল, জীবনযাপনে অথবা সামাজিক চিন্তা ও বিশ্বাসে মানুষ কেমন ছিল, এ নিয়ে কোনো সাধারণ কৌতূহলী জিজ্ঞাসারও আর একালে ঠিকমতো জবাব দেওয়া হয় না। ফলে আমাদের অনেকের আর জানাও হয়নি। বিশেষ করে একালের তরুণ প্রজন্মের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই, সেকালে মানুষ কেমন করে ভাবত। কী ভাবত ও কেন ভাবত; বরং সাধারণভাবে এমন দাবি ও প্রচার জারি করে রাখা হয়েছে, যেন ওটা হলো একটা কালো অধ্যায়, যেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান কায়েম সঠিক হয়নি বলে মনে করত—এমন ধরে নিতে হবে, বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান হাসিনার শাসনের বিরোধিতা বা অপছন্দ যারা করেন, এটা করা মানে তারা বাংলাদেশ গঠনকেই অপছন্দ করেন—এমন অর্থ করার সুযোগ নেই। এমন উদ্দেশ্যমূলক অর্থ করার মানে হবে—পাকিস্তান আমলে 'পাকিস্তান কায়েম ঠিক হয়নি' বলে ভিত্তিহীন অনুমান চালিয়ে দেওয়ার মতোই। সাতচল্লিশের দেশভাগের আগ থেকে শুরু করে পরে পাকিস্তান গঠনসহ যা কিছু হয়েছে, এর সবকিছুকেই ভুল আর ভুল বলে এক নেতিবাচক অর্জন গণ্য করতে হবে—সাধারণভাবে এই হলো সেই মিথ্যা ও ইসলামবিদ্বেষের আঁতুড়ঘর।

আর একটি প্রসঙ্গ হলো দেশভাগ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বা পাকিস্তান সৃষ্টি ভুল হয়েছিল; কলকাতা থেকে প্রকাশিত বই পুস্তকে এই ভাষাতেই তা লেখা হয়েছিল ও আছে এবং এখনও তা-ই লেখা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানসহ সারা পাকিস্তানে কি এমন করেই লেখা হতো? পাকিস্তান কায়েমের পরে, বই ছাপানোর মতো আমাদের থিতু হয়ে গোছানো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর, পূর্ব পাকিস্তানের ছাপা বই-পুস্তকের বয়ান-ভাষ্য এটা নয়। আর কলকাতার বয়ানটা এখানে আনা বা চালু করা বাস্তবে সম্ভবও ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, স্বাধীন পাকিস্তানে বসে পাকিস্তানের সুবিধা ভোগ করে, শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে এরপর আবার পাকিস্তান গঠন ভুল ছিল বলা—এটা একটু কঠিনই শুধু না; অসম্ভবও ছিল। এ ছাড়া তা 'দেশদ্রোহী' হয়ে যাওয়ার ব্যবহারিক দিক তো আছেই। ফলে যারা স্বাধীন পাকিস্তান গড়ে উঠার সুবিধাভোগী, তারা অন্তত পাকিস্তান গঠন ভুল হয়েছে তা বলতে পারে না; এটা তাদের বলার কোনো জো নেই। এমনকী ভারতে থাকা বাঙালি মুসলমানরা, যারা কলকাতার বয়ান, ভাষ্যের প্রভাবে বড়ো হয়েছেন, শিক্ষিত হয়েছেন—এরাও সেই পাকিস্তান কায়েমেই আকুল হয়ে হিজরত করে এ দেশে চলে এসেছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

পাকিস্তান তাদের জন্য বিপুল চাকরি বা সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে হাজির হয়েছিল এবং তারা তা আনন্দে গ্রহণ করতেই পাকিস্তানে ছুটে এসেছিলেন। ফলে সেই জনগোষ্ঠীও পাকিস্তান গঠন ভুল হয়েছে এমনটা মনে করতেই পারে না। তাদের মনে যা-ই থাক, অন্তত প্রকাশ্যে তা প্রচার করার মতো বোকা হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচন আর বিশেষ করে ষাটের দশকজুড়ে আন্দোলন-সংগ্রাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের ধারণা খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী পাকিস্তানকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল এই বলে যে, এটা কেবল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের পাকিস্তান; পূর্ব পাকিস্তানিরা এখানে কিছুই না। অখণ্ড পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায্য শেয়ার না দিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। আর নিজেরা পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর প্রভুসুলভ, ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো আচরণ শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় এসে মুসলিম লীগসহ বেশিরভাগ ইসলামি দল পুরোপুরি পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সমর্থক হয়ে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ওইসব দলের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়ে যায়। গণবিরোধী হয়ে যায় তারা। কিন্তু তাই বলে এদের অবস্থানকে এমন ধারাক্রমে না বুঝে, শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানিদের চোখে পাকিস্তান গঠন করা ভুল আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা 'গণবিরোধী' ছিল—এই অনুমান চাপিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক হবে; বরং সত্তর দশকের শুরুর দিকে অবস্থানকে মূলত ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে যে, তাদের চোখে পাকিস্তান গঠন করা সঠিকই ছিল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কারণেই এটা চালু রাখা বা টিকানো গেল না। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে এ কথা বলছি, সে কথাই এখানে বলব।

তবে তার আগে 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব'। অনেকের ধারণা, অন্তত এক অর্থে দেশভাগ বা পাকিস্তান সৃষ্টি ভুল ছিল। কারণ, পাকিস্তানে নাকি 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' এমন এক ভুল তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। আগে থেকেই 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' বলে ভুল একটা ধারণা মুসলমানদের মাথায় গেড়ে বসেছিল! আর এরই ফল হলো দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ। এদের যুক্তি হলো—যেহেতু 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' তত্ত্ব হিসেবে সঠিক নয়। কারণ, ধর্মের ভিত্তিতে জাতি হয় না অথবা জাতির ভিত্তি ধর্ম হতে পারে না; অতএব, দেশভাগ ভুল। এদেরই আর একটা যুক্তি হলো—ভারতে হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও আরও অনেক ধর্ম যেহেতু আছে, ফলে 'দ্বি-জাতি' বা ভারতে

https://nagorikpathagar.org

'দুটোই মাত্র জাতি'—এ কথাটারও সত্যতা নেই। এই বয়ানের উদ্গাতা হলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন–

> 'পাকিস্তান প্রস্তাবের বড় দুর্বলতাটি ছিল 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' নিয়েই। বহুজাতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত কেবল দুজাতির দেশ হয়ে যাবে, এ বিষয়ে জিন্নাহ ভাবেননি।'[১২২]

দেশভাগ বা পাকিস্তান সৃষ্টি ভুল এ কথার সপক্ষের বয়ানগুলোর মধ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বয়ান সবচেয়ে জুতসই বলে তারা অনেকেই মনে করে থাকেন। আমল করেন। অথবা বলা যায়, দুই বাংলা মিলিয়ে দেশভাগের বিরোধী যত বয়ান আছে, সেসবের মধ্যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের তাত্ত্বিক ভুল আবিষ্কার করে, দেশভাগ ভুল বা দেশভাগ বিরোধী অবস্থান নেওয়ার দিক থেকে চৌধুরিরটাই বড়ো প্রভাবশালী বয়ান।

দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভুল বের করা এই তত্ত্বকারেরা মূলত ইসলামবিদ্বেষী কমিউনিস্ট বা প্রগতিবাদী। যদিও এরা মূলত জাতিবাদী। এদের চিন্তার ভুলটি হলো—এরা মনে করে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারলেই 'পাকিস্তান কায়েম করা দরকার ছিল'—এই আইডিয়া পরাস্ত হয়ে যাবে। আর এর বদলে এই তত্ত্বকারদের পছন্দের 'একজাতি' তত্ত্ব, মানে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' জিতে যাবে বা যেত। কমবেশি এরা সবাই মনে করে যে, ১৯৪৭ সালের আগে আমাদের সবার উচিত ছিল 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ'-এর পক্ষে থাকা। এরা ধরেও নেয়—যেন সব সমস্যা শুরু করেছে, তৈরি করেছে মুসলমানেরা।

মুসলমানেরা 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' আনার কারণেই 'এক জাতি' তত্ত্ব মানে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' আইডিয়া আর কাজ করতে পারেনি। যদিও প্রকৃত বিচারে এটা নেহায়তই তাদের এক হাতুড়ে অনুমান। বলা যায়—এটা আইডিয়াল বা আদর্শবাদী অনুমান, যা ভিত্তিহীন। মজার কথা হলো—যারা নিজেদের প্রগতিশীল বা কমিউনিস্ট মনে করে, এরাও এক কল্পিত 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের' পক্ষে অবলীলায় অবস্থান নেয়। কমিউনিজমের আগে এক জাতীয়তাবাদী উত্থানের অনিবার্যতা দেখেই তারা এই অবস্থানে জাম্প মারে।

দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এদের সব আপত্তির মধ্যে কমন আপত্তি হলো—এটা ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত। আর এদের ধর্মবিদ্বেষী পাঠ অনুসারে ধর্ম খুবই খারাপ জিনিস এবং 'নীচু চিন্তা'; ফলে তাদের প্রবল ও অন্যতম আপত্তির

---

[১২২]. পৃষ্ঠা : ২৩৭, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি।*

https://nagorikpathagar.org

উৎসটাও এখানেই। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষী এই কমিউনিস্টরা কী করে নিশ্চিত হলেন—'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' মূলত 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' নয়?

কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবির সদস্য যতীন সরকারের লেখা *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন* [১২৩] নামে একটা বই আছে। যতীন সরকারও 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' এবং পাকিস্তান কায়েমের সমালোচক। তাঁর এই বই অনেকটা তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করে লেখা। কিন্তু আমাদের জন্য এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো—তার বইয়ের প্রথম কয়েক অধ্যায়জুড়ে তিনি বর্ণনা করেছেন হিন্দুদের জাতপাত বোধ, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি কত প্রকট সমস্যা হয়ে সেকালে হাজির ছিল। এ প্রসঙ্গে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি তিনি সেখানে বর্ণনা করেছেন, সেটাই এখানে পাঠকের জন্য তুলে আনব। তাঁর ভাষায়—

> 'আসলে সে সময়েও হিন্দুত্ব আর অস্পৃশ্যতা ছিল সমার্থক। আচারসর্বস্ব হিন্দুত্বের প্রধানতম আচারি ছিল খাওয়া আর ছোঁয়া সম্পর্কীয়।'[১২৪]

তিনি আরও বলছেন—

> '...মুসলমানদের যে হিন্দুরা অস্পৃশ্য করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে, সে অস্পৃশ্যতা বর্জনের কার্যকর উদ্যোগ কেউই গ্রহণ করল না।... মুসলমানদের অস্পৃশ্য করে রেখে যে হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় ঐক্য বা এক জাতিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এই সহজ কথাটা কোনো রাজনৈতিক নেতাই তেমন করে বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি।'[১২৫]

এ ছাড়াও তাঁর বইয়ের ওই পৃষ্ঠাতেই খোদ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে ঠাকুরের নিজের জমিদারির কাছারি বাড়িতে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের বসার আয়োজনে ফারাক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা আছে, যতীন সরকার সে কথাটুকু এনে আমাদের জন্য হাজির করেছেন। বলছিলেন, হিন্দু প্রজার বসবার জন্য পাটি পেতে দেওয়া আর মুসলমান প্রজাদের জন্য পাটি ছাড়া মাটিতে বসার ব্যবস্থার কথা আছে খোদ রবি ঠাকুরের বয়ানে।

---

১২৩. যতীন সরকার, *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮

১২৪. যতীন সরকার, *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী পৃষ্ঠা : ৯৭

১২৫. যতীন সরকার, *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী পৃষ্ঠা : ৯৯

https://nagorikpathagar.org

এখানে আমাদের জন্য মূলকথা হলো—যতীন সরকারের কথা থেকে আমরা এটুকু পরিষ্কার হই যে, সমাজে এক জাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। এক প্রকট সমস্যা হয়ে তা সামনে খাড়া হয়েছিল। মুসলমান অথবা নমঃশূদ্র নামে ডাকা দলিত এই শ্রেণির মানুষ কখনোই ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষদের চোখে একই সামাজিক 'জন' গণ্য হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে সকলকে নিয়ে পাবলিক বা জনস্বার্থ অথবা 'জনগণ' ধারণাটিই সেখানে অনুপস্থিত ছিল। ফলে বাস্তবে কংগ্রেস মানে হিন্দু (বর্ণহিন্দু) জাতীয়তাবাদের কংগ্রেস-ই। অর্থাৎ এমনকী তা কেবল আসলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর দল।

দলিতদের নেতা অম্বেদকার তা সে সময়ে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। বর্ণপ্রথার দিন এখনও শেষ হয়নি, এখনও ভারতের দলিতেরা বুঝতেছে। ওদিকে এখনও প্রায় ২৯ রাজ্যে বিভক্ত ভারতের সবাই এক হয়ে এক রাষ্ট্রে আছে বটে, কিন্তু এই থাকার, এক রাষ্ট্রে আটকে থাকার গ্লু বা আঠার নাম কী? এ আঠার নাম 'হিন্দুত্ব'। তা-ও মূলত বর্ণপ্রথার হিন্দুত্ব। ভারতের রাজনৈতিক নেতারা বিশ্বাস করতে পারেন না যে, এই আঠা মানে এই পরিচয়, এই হিন্দু আইডেনটিটি ছাড়া এক রাষ্ট্রে সবাইকে ধরে রাখা সম্ভব। ফলে স্বভাবতই জন্ম থেকেই এটা হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদ। আর এবার বিজেপি-আরএসএসের আমলে এসে এতদিন লুকিয়ে রাখা সেকালে কায়েম করা 'ভারত রাষ্ট্রের হিন্দুত্ব' খুবই সুবাস ছড়াচ্ছে।

এ ছাড়া ওদিকে ইতিহাসের আর এক সত্যতা হলো, কংগ্রেসের জন্মের (১৮৮৫) দীর্ঘ ২০ বছর পরে মুসলিম লীগের জন্ম (১৯০৬) হয়। অর্থাৎ আপনি যদি 'হিন্দু' আর 'ভারতীয়' সমার্থক শব্দ বলে বুঝে থাকেন, হিন্দু আধিপত্য কায়েমকে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' বলে চালিয়ে দিতে চান, তবুও সেটা তো মূলত সেই হিন্দু জাতীয়তাবাদই। আর এটা যদি গড়তেই থাকেন মনের সুখে, তা হলে (২০ বছর) পরে তো মুসলিম লীগ নামে আলাদা প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক রাজনৈতিক দলই দেখবেন। তাই নয় কি! তা-ই হয়েছিল সেকালে।

আর এক বিরাট প্রশ্ন তোলাই হয়নি, রয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো—জাতি কী? নেশন স্টেট বা জাতিরাষ্ট্র সেটাই-বা কী? ওপরে লিখেছিলাম যে, 'ধর্মের ভিত্তিতে জাতি হয় না বা জাতির ভিত্তি ধর্ম হতে পারে না। অতএব, দেশভাগ ভুল।' এই ভুল অনুমান প্রসঙ্গে দুটো মন্তব্য। মূলত 'জাতিরাষ্ট্র বা নেশন স্টেট' ধারণাটা সব ভুলের মূল। এই ধারণাটা ভুতুড়ে শুধু নয়; বরং রেইসিজম বা বর্ণবাদী ধারার আত্মপরিচয়কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ধারণারও উৎস।

https://nagorikpathagar.org

যেকোনো জাতীয়তাবাদ কোনো 'অপর' জনগোষ্ঠীকে কুপিয়ে নির্মূল করে ফেলার পক্ষে সাফাই তৈরি করে ফেলতে পারে এবং তা করেও থাকে। জাতীয়তাবাদ এক্ষেত্রে বয়ান সরবরাহকারী বলে চিহ্নিত। তবুও অনেকে বলতে চান, শুধু ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী হওয়াটা খুব খারাপ। কিন্তু আর বাকি সবকিছু যেমন: ভাষা, ভূখণ্ড, ভূগোল ইত্যাদি ভিত্তির জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ অন্য যেকোনো কিছুর ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ হলে সেটা জায়েজ। এই ধারণাও সমান ভুল ও ভিত্তিহীন। যেকোনো কিছুকে ভিত্তি হিসেবে নেওয়া অর্থাৎ যে ধর্ম, ভাষা, ভূখণ্ড, ভূগোল এমনকী কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মের সেক্ট যেমন: শিয়া বা প্রটেস্টটানিজম ইত্যাদি, এমন যেকোনো কিছুকে পরিচয় বা আইনডেনটিটি হিসেবে নিলেও ফল একই হবে।

যেকোনো ভিত্তির জাতীয়তাবাদ মাত্রই এর বিপদ সম্ভাবনাগুলো তাতে থাকবেই, তবে সেটা প্রকটভাবে টের পাওয়া যাবে। যখন আক্রমণাত্মকভাবে কোনো পরিচয় বা জাতীয়তাবাদ হাজির হতে চাইবে, কেবল তখনই ওর বর্ণবাদী বৈশিষ্ট্য সবার নজরে পড়ে; এর আগে না। এই আর কি! কিন্তু বাকি সময় তা নজরে না পড়লেও সব ধরনের জাতীয়তাবাদ বা পরিচয়ের (আইডেনটিটির) রাজনীতিতে বর্ণবাদের বিপদ সুপ্ত অবস্থাতে থাকে। ফলে কেবল ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ হলেই সেটা বিপদের; আর অন্য কিছু হলে জায়েজ–এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। আসলে জাতীয়তাবাদী চিন্তা মাত্রই তা আইডেনটিটির রাজনীতি, আর তা রেসিজমের সম্ভাব্য উৎস–এই হলো মূলকথা।

কৃষকের জমি পাওয়ার সংগ্রাম আর প্রজা মুসলমানের মুক্তির লড়াই

এখানে তরুণ পাঠকদের কথা মাথায় রেখে একটা বিষয়ে কিছু কথা পরিষ্কার করা দরকার। এই অঞ্চলের ইতিহাসে অন্যতম মৌলিক-ভিত্তিমূলক একটা ফ্যাক্ট হলো, ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'-ই হলো পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান আন্দোলনের' পরিচালক। তবে আরও ফ্যাক্টস হলো–সেটা দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে শুরু হয়নি; বরং সে সময় বলা হতো–ব্রিটিশ-ভারতের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোকে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্রের কথা। তবে তা-ও আবার শুরুর দিকে পূর্ববঙ্গের নাম মুসলিমপ্রধান অঞ্চলের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেশভাগের আগের শেষ দশ বছরে। আর মনে রাখা দরকার, 'পাকিস্তান আন্দোলনের' বা আলাদা রাষ্ট্র আদায় আন্দোলনের সবচেয়ে কার্যকর সক্রিয়তার সময়কাল ছিল ১৯৩০-৪৭ সালের এই সময়কালে।

https://nagorikpathagar.org

পূর্ববঙ্গের জমিদার উচ্ছেদ আর প্রজাদের জমি পাওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল দল ছিল মুসলিম লীগ। ১৯৩৫ সালে কৃষক প্রজা পার্টিও ছিল। যদিও মুসলিম লীগের ভেতর এই প্রশ্নে চড়াই-উতরাই ছিল।

আবার এক নিশ্বাসে এটাও বলা দরকার যে, সেই মুসলিম লীগই কিন্তু আবার ১৯৭১ সালে এসে রাজাকারের দল হয়েছিল। অর্থাৎ একই বৈশিষ্ট্যের মুসলিম লীগ সে আর তখন ছিল না। তাই সাবধান! মুসলিম লীগ মাত্রই নেতি ঘটনা–এ কথা যেমন সত্যি না। আবার ১৯৪৭ সালের আগে ও পরে সবটাই রাজনৈতিক ভুল, এই অনুমানের কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নেই; একেবারেই ভিত্তিহীন। তবে ভারতের লিখিত প্রধান ধারার ইতিহাস এই মিথ্যার ওপরেই লিখিত। অথচ পুরো পাকিস্তান তো বটেই, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কাছেও দেশভাগ একটা অত্যন্ত ইতিবাচক ঘটনা।

এ ছাড়া আর একটি বড়ো ঐতিহাসিক সত্য হলো, শেখ মুজিব থেকে শুরু করে তাজউদ্দীন, মোশতাক, তোয়াহাসহ প্রায় প্রত্যেক মুসলমান নেতা (কমিউনিস্টসহ) সবাই ১৯৪৭ সালের আগে মুসলিম লীগই করতেন। মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমান যারা সেকালের রাজধানী কলকাতায় পড়ালেখা করতে গিয়েছিলেন; যেটাকে ১৯০০ সালের পরের মুসলিম মধ্যবিত্ত গড়ে উঠার ফেনোমেনা বলা যায়, তাদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু, হাতেখড়ি এই মুসলিম লীগে।

সেকালে কমবেশি এরা সবাই খুব সক্রিয়ভাবে 'পাকিস্তান আন্দোলন' করেছেন। শেখ মুজিবের জীবনী সেই সময়কে ধরার ও বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দলিল। এখনকার বাংলাদেশের সিনিয়র নাগরিক, যারা ১৯৩০-৪৭ এই সময়কালে অন্তত ১৮ বছরের বেশি বয়সের ছিলেন, এমন সবাই পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ছিলেন, তাতে বাংলাদেশে বর্তমানে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন! আর সেটাই স্বাভাবিক। যেমন: অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; এরা পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, যা তাঁদের আত্মজীবনী বা সাক্ষাৎকার থেকে সহজেই জানতে পারা যায়। সেখানে তাঁরা তখন সেটা কোনো খারাপ কাজ করেছেন বা কোনো 'না বুঝে জড়িয়ে গিয়েছিলেন' জাতীয় ঘটনা বলে এখনও মনে করেন না, এমন দাবি করেন না, এমন কোনো ইঙ্গিতও করেননি।

তা হলে মূলকথা, স্বাধীন পাকিস্তানের পরবর্তী দিনগুলোতে বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মুসলিম লীগকে দেখে সেই আলোকে যৌবনের মুসলিম লীগকে আঁকা, ইঙ্গিত দেওয়া শুধু ভুল নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পাকিস্তান আন্দোলনের মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান কায়েমের মুসলিম লীগকে এর জীবনের শেষকালের রাজাকারি নেতিবাচক ধারণা দিয়ে বোঝাটা ইতিহাসের সত্যতাবিরুদ্ধ ও মতলবি।

https://nagorikpathagar.org

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখানে বলে রাখা দরকার। এমন একটি ভুল ধারণা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, যেন শুরুর মুসলিম লীগও একটা অজনপ্রিয় দল ছিল। যেন মুসলিম লীগ ভারত ভাগ করে পাকিস্তান কায়েম করেছে অথচ পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান জনগোষ্ঠী তা চায়নি। পছন্দ করেনি। এই অনুমান মিথ্যা এবং অনৈতিহাসিক। মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছে অথচ শুরুতে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তাতে যোগ দেয়নি। অথবা কেউ কেউ অন্য কোনো দল বা সংগঠন করেছে, এমন অবশ্যই ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর থেকে কিছু ব্যতিক্রম বাদে মোটা দাগে মুসলমান মাত্রই সকলের ঠিকানা ছিল মুসলিম লীগ। এমনকী ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' চালু হওয়ার পর এ. কে. ফজলুল হক 'কৃষক প্রজা পার্টি' খুললেও পরে তিনিও মুসলিম লীগে যোগ দেন।

এবার এক নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে মুসলমান কনস্টিটিউয়েন্সি বলে আলাদা ভাগ করা হয়েছিল, ১৯৩৫ সালের পরে। আর মুসলিম লীগ মুসলমান কনস্টিটিউয়েন্সির রাজনৈতিক দল ছিল। কনস্টিটিউয়েন্সি ভাগ মানে? সেটা আবার কী? একালের নিরিখে 'কনস্টিটিউয়েন্সি ভাগ' বোঝা সহজ নয় হয়তো। তবু অনেকেই হয়তো জানেন না অথবা জানেন কিন্তু তাৎপর্য খেয়াল করেননি, এমন একটা বড়ো ফ্যাক্ট আছে। তা হলো, মুসলমান কনস্টিটিউয়েন্সি।

'ভারত শাসন আইন ১৯৩৫', (পুরোনো ভারত শাসন আইন ১৯১৯ সালের আইনের সংশোধিত রূপ এটা)। এই আইনের ফলে কলোনি ভারতের 'নেটিভ' মানে স্থানীয়রা এই প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নিজেরা প্রাদেশিক সরকার গঠন করার সুযোগ পায়। এ ছাড়া প্রিন্সলি স্টেটগুলো (করদ রাজ্য) বাদে ব্রিটিশ ভারতে কেবল প্রেসিডেন্সি হিসেবে পরিচালিত প্রশাসনিক এলাকাগুলোতে এই নির্বাচন হয়েছিল, প্রেসিডেন্সিগুলোতে একটা করে স্থানীয় প্রাদেশিক সরকার গঠন করার জন্য। যদিও যারা পাঁচ আনা বা তার ঊর্ধ্বে খাজনা দেয়, কেবল তারাই ওই নির্বাচনের ভোটার হতে পেরেছিল। কিন্তু এই প্রথম প্রাদেশিক সরকার নির্বাচনের মুখ্য বিষয় হলো, বাংলাকে মুসলমান কনস্টিটিউয়েন্সিসহ আরও নানা ধরনের কনস্টিটিউয়েন্সিতে ভাগ (কনস্টিটিউয়েন্সি শব্দের সাধারণ অর্থ একেক প্রার্থীর ভোটিং এলাকা বা নির্বাচনী এলাকা) করে নেওয়া হয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

আসলে ব্রিটিশ ভারত বলতে তিনটা প্রেসিডেন্সি (কয়েকটা প্রদেশ নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক এলাকা), কতগুলো প্রভিন্স আর সাড়ে পাঁচশোর মতো ছোটো-বড়ো করদ রাজ্যে এসবের সমন্বয়ে মিলিত অঞ্চলকে বোঝাত। ওই প্রাদেশিক নির্বাচন এটাই ছিল কলোনি শাসকের দিক থেকে সর্বোচ্চ ছাড় যে, সে ভারতের মূল ক্ষমতার ভাগ না হোক, অন্তত প্রদেশে স্থানীয়ভাবে সরকার গঠন করতে দিয়েছিল। কিন্তু এই আইনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, ওই নির্বাচনে মুসলমানরা মুসলমানকে, শিখরা শিখকে এভাবে ভোট দেবে। এভাবে পেশা বা ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদি বিভিন্ন আইডেনটিটির ভিত্তিতে এক একটা কনস্টিটিউয়েন্সি বা আসন ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। আবার বাকিগুলো কমন কনস্টিটিউয়েন্সিতে সবাই সবাইকে ভোট দিতে পারবে, এই ভিত্তিতেই ভোট হয়েছিল।

যেমন: ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫০। এর মধ্যে সাধারণ আসন ৭৮টি, মুসলমান প্রার্থীদের আসন ১১৭টি (শহরে ৬টি এবং গ্রামে ১১১টি); অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য বরাদ্দ আসন ৩টি, ইউরোপীয়দের জন্য বরাদ্দ ১১টি, ভারতীয় খ্রিষ্টানদের জন্য ২টি, বাণিজ্য, শিল্প ও পুঁজিবাদী কৃষি আসন ১৯টি, জমিদার বা ভূস্বামীদের জন্য আসন ৫টি, শ্রমিক প্রতিনিধির আসন ৮টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের আসন ২টি (ঢাকা ১টি ও কলকাতা ১টি) এবং মহিলা আসন ৫টি (সাধারণ ২টি, মুসলিম ২টি এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ১টি)।

দেশভাগের আগে এই আইনে মাত্র দুবার নির্বাচন হতে পেরেছিল; ১৯৩৭ আর ১৯৪৬ সালে। দুবারই মুসলমানরা বাংলায় সরকার গঠন করতে পেরেছিল। বিশেষ করে পরের বার ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ পেয়েছিল ১১৩ আসন (মোট ২৫০ আসনের) ফলে ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

কথাটা বলছি এজন্য যে, দেশভাগ বা পাকিস্তান কায়েমের সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের এক জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত ছিল। আর এই সিদ্ধান্তের বহনকর্তা ছিল মুসলিম লীগ। ফলে মুসলিম লীগ জনপ্রিয় দল ছিল।

যদিও ১৯৪৭ সালের পরের প্রধান ধারার লিখিত ইতিহাসে মুসলিম লীগকে ঘৃণিত কিছু একটা বলে পরিত্যাজ্য করে ফেলা হয়েছে। ফলে সে 'কেন জনপ্রিয় ছিল' সেই কারণ এবং এর সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টসও স্বভাবতই আড়াল করে ফেলা হয়েছে। যদিও এখানে সেসব খুব বেশি বিস্তারে বলার স্থান নয়;

https://nagorikpathagar.org

সে প্রসঙ্গে আলাদা করে লিখতে হবে। খুবই সংক্ষেপে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা আর বাঙালি মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়া কেন আরাধ্য ও কাম্য ছিল, সে কারণ ব্যাখ্যা করব।

ব্রিটিশ আমলের পূর্ববঙ্গ, পাকিস্তান আমলের যেটা পূর্ব পাকিস্তান, সেটাই একালের স্বাধীন বাংলাদেশ। ব্রিটিশ আমলে ধর্ম নির্বিশেষে এর জনগোষ্ঠীর ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল জমিদারের প্রজা বা কৃষিকাজ ভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত। মাও সেতুংয়ের ভাষায় কিছু কথা বলব, অল্প কথায় বলার সুবিধা নিতে। প্রত্যেক সমাজেই সদস্য সব মানুষের মধ্যে ছোট-বড় অসংখ্য কিসিমের স্বার্থদ্বন্দ্ব থাকে। তাই সমাজ মানেই ছোটো-বড়ো অসংখ্য স্বার্থদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকা মানুষ। এগুলোর মধ্যে কেবল একটা দ্বন্দ্ব থাকে, যে দ্বন্দ্বে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ জড়িত থাকে, তাদের স্বার্থ জড়িত থাকে। সেটাই ওই সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব।

মাও-এর ভাষায় কমিউনিস্টদের কাজ হলো—এই প্রধান দ্বন্দ্ব-লড়াইকে মুখ্য করে তোলা, ফোকাসে আনা, চোখা করা। আর এই দ্বন্দ্ব নিরসনের কাজে, পক্ষে-বিপক্ষে শ্রেণি সমাবেশ হওয়ার দিকে পরিস্থিতিকে ঠেলে দেওয়া বা সাজানো।

ব্রিটিশ ভারতের কেবল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থা ছিল জমিদার-প্রজা। অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য কাউকে ঠিকা দেওয়া। এই ঠিকা নেওয়াই ছিল জমিদারি কেনা। জমিদারকে আগেই নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব ব্রিটিশ শাসককে জমা দিয়ে জমিদারি নিতে হতো। এভাবে স্থায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমিদারের কাছে আদায় করা ছিল ব্রিটিশ শাসকের আয়ের উৎস। মানে কলোনি মাস্টার প্রতি বছর নিজের রাজস্ব আয়কে স্থির রাখার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন এভাবে। তাই এভাবে জমিদারিব্যবস্থা কায়েম করেছিল। এতে প্রতি বছর মোট কত রাজস্ব তার আয় হবে, তা আগেই জানা থাকত। ফলে সে অনুসারে খরচের পরিকল্পনা সবই যেন আগেই জানা থাকতে পারত।

সারকথায় এভাবে কলোনি স্বার্থের অধীনে কায়েম করা হয়েছিল এক 'জমিদার-প্রজা' সম্পর্ক। এটাই ছিল ওই সমাজ ও অর্থনীতিতে প্রধান দ্বন্দ্ব। খাজনার পরিমাণ নির্ধারণে এবং তা আদায়ের জন্য জমিদার যথেচ্ছাচার করত। তারা বছরের খাজনা তো আদায় করতই; সেইসঙ্গে বারো মাসে তেরো পূজা, এমনকী জমিদারের পারিবারিক সব অনুষ্ঠানের যেমন বিয়ে বা বাচ্চার মুখে ভাতের অনুষ্ঠানের খরচ ইত্যাদি সবকিছুর জন্য, আলাদা আলাদা করে খাজনা আদায় করত। এর প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়ভাবে যে প্রতিরোধের

https://nagorikpathagar.org

লড়াই-সংগ্রাম হয়েছে, তার প্রথম একশ বছর কেটেছে ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনে। হাজি শরীয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে ১৮১৮ সাল থেকে সংগঠিত তা ফরায়েজি আন্দোলনের ইতিহাস হয়ে আছে।

আলোচনা সংক্ষেপ করতে সে বিস্তারে এখানে যাচ্ছি না। সরাসরি চলে যাচ্ছি বিশ শতকে; গত ১৯০৬ সালে জন্ম নেওয়া দল মুসলিম লীগের জন্মের পর থেকে। সেই মুসলিম লীগের বহু দোষত্রুটি একালে আমরা খুঁজে পাবো হয়তো। কিন্তু জমিদার উচ্ছেদের ইস্যু নিয়ে কথা বলার দল হিসেবে মুসলিম লীগের চেয়ে বেশি র‍্যাডিক্যাল অন্য কোনো দল ছিল না। তা ছাড়া বিষয়টি আজ সব তর্কের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। কারণ, স্বাধীন পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন ওই মুসলিম লীগ দলের হাতেই ১৯৫১ সালের ১৬ মে জমিদারি উচ্ছেদ আইন 'The State Acquisition And Tenancy Act, 1950' পাস হয়ে গেছে। এটাই জমিদারি উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন। এতে লর্ড কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩ সালে কায়েম করা 'পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট আইন' বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি প্রথা আইনগতভাবে উচ্ছেদ হয়ে যায়।

আমরা যদি কোনো একটা দলের—কী এর নাম, নামের মধ্যে কমিউনিস্ট শব্দ আছে কি না, ওর নামের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়মূলক শব্দ আছে কি না, ওর ঝান্ডার রং লাল কি না, সে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ করে কি না ইত্যাদি দিয়ে ওই দলের মূল্যায়ন করি, আমরা এভাবেই করতে অভ্যস্ত। এই যে আমাদের অভ্যাস এটা আসলে ঘোরতর ত্রুটিপূর্ণ। কেন ত্রুটিপূর্ণ বললাম কারণ 'প্রগতি' নামের চিন্তার চোখে, মুসলিম লীগের চেয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে থাকা আদরণীয় ও কাম্য দল। অথচ ইতিহাস হলো–মুসলিম লীগ কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও যেমনটা সব দলেরই কিছু না কিছু থাকে–জমিদার উচ্ছেদ ইস্যুতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর বিপরীতে কমিউনিস্ট পার্টি এর সমতুল্য তো দূরে থাক, তুলনায় কাছাকাছিও কিছু নয়। কারণ, কমিউনিস্টদের সর্বোচ্চ অর্জন বলে দাবিকৃত আন্দোলন হলো–তেভাগা আন্দোলন। যেটা জমিদারি প্রথা চালু রেখে এরপর জমির ফসল ভাগাভাগি কী হবে, সে নিয়ে আন্দোলন।

মূল কথা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জমিদারিব্যবস্থা রক্ষার স্বার্থই ছিল সেকালে বাকি সব রাজনৈতিক সামাজিকগোষ্ঠীর স্বার্থ। জমিদারি ব্যবস্থারই আর এক নাম ও প্রকাশ হলো—সারা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক হেজিমনি। বাংলা বলে (বাংলার নবজাগরণ, বাংলা সাহিত্য,

https://nagorikpathagar.org

বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ইত্যাদি) যা কিছু সে সময়কাল থেকে জন্ম নিয়েছিল, এই বাংলা প্রজেক্ট, এর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হলেন জমিদার। মানে জমিদারিব্যবস্থা। আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো এই বাংলা প্রজেক্টে কোনো মুসলমান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, ছিল না। এমনিতেই মুসলমানেরা ছিল অচ্ছুত অস্পৃশ্য। জাতপ্রথার বিচারে দলিত হিন্দুরও নিচে শেষের স্তরে এর অবস্থান। ফলে বাস্তবত এটা ছিল কেবল বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর নবজাগরণ বা রেনেসাঁ। যার বাইরের ডাকনাম হিন্দু জমিদারদের 'বাঙালি প্রজেক্ট'। কার্যত একে আমরা ডাকতে পারি হিন্দু নবজাগরণে 'জমিদার বাঙালি' প্রজেক্ট।

নাম যা-ই হোক, ভেতরে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে, বাংলার মুসলমানেরা 'জমিদার বাঙালি' প্রকল্পের কেউ নয়, এই ছিল অনুমান। মুসলমানেরা এই 'জমিদার বাঙালি' ধারণার ভেতরের কেউ না, সে অন্তর্ভুক্ত নয় এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং বাস্তবত এটাই প্র্যাকটিস ছিল। এ কারণেই শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে 'ইস্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ' খেলার কথা দেখি আমরা আবার জমিদারেরা সেকালে তো বটেই, এমনকী এই ১৯৯০ দশকে এসেও দেখি, কিশোরগঞ্জের প্রাক্তন জমিদার এবং সাহিত্যিক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী 'মুসলমানদের বাঙালি মনে করেন না' বলে সদর্পে তখনও জানান দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাই ঠিক এর বিপরীতে পূর্ববঙ্গের সকল মুসলমান জনগোষ্ঠীর একক স্বার্থের দল হয়ে উঠেছিল মুসলিম লীগ। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

এজন্য জমিদার উচ্ছেদ প্রকল্পের সেনানী হওয়ার যোগ্য দল হয়ে উঠতে পেরেছিল মুসলিম লীগই। কবে আইন পাস হবে তা নিয়ে কিছু গড়িমসি হয়তো করেছে, কিন্তু শেষে উচ্ছেদের আইন পাস করেছে। এককথায় দেশভাগ, পাকিস্তান কায়েম এবং ১৯৫১ সালে জমিদারি উচ্ছেদের প্রধান সুবিধাভোগী হলেন পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সকলে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আজকের বাংলাদেশের প্রতিটা পুঁজি সঞ্চয় শুরু হয়েছিল ওর বীজ ওই জমিদারি উচ্ছেদ আইন থেকে। চাষার জীবন-দোষ সেই থেকে নিজেই নিজের বিকাশের বাধা উপড়ে ফেলেছিল; আর নিজেকে অর্গল ও অভিশাপমুক্ত করে।

আজকের বাংলাদেশের উত্থান ও অবস্থান প্রমাণ করে, একটা জনগোষ্ঠীকে কীভাবে সেকালে জমিদার শাসনের সাপ্রেশনে বা দাবায়ে রাখা হয়েছিল। এমনকী একালে ২০১৭ সালে এসে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন কিঞ্চিৎ স্বীকারোক্তি করে বলছেন–'দেশভাগের সময় একটা ব্যাপার হয়েছিল :

https://nagorikpathagar.org

বেশিরভাগ জমিদার হিন্দু ছিলেন, তারা পালিয়ে গেলেন। ফলে বিনা যুদ্ধে একটা ভূমি সংস্কার হয়ে গেল, যেটা আর্থিক ভেদাভেদ অনেকটা কমিয়ে দিলো এবং তার ফলে সমবেত আন্দোলন গড়ে তোলা তুলনায় সহজ হলো।'

অর্থাৎ অমর্ত্য সেনের কিছু বোধোদয়ের হদিস কেবল একালে এসে পাওয়া যাচ্ছে এখন মোদির চলতি জামানায় হিন্দুত্বের রাজনীতির জোয়ার দেখার পর পালটা কী করা উচিত, সে প্রসঙ্গে তিনি আনন্দবাজারকে বলছেন, 'আমাদের দেশে জাতিভেদের কাঠামোটা খুব প্রাচীন। এখন, নিচের তলার মানুষের প্রতি উঁচু জাতের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটার মধ্যে তো আইডেন্টিটি বা সত্তার একটা প্রশ্ন আছে। এবং সেটা রক্ষণশীল হিন্দু আইডেন্টিটি। এই সত্তাটাকে বাকি সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা বরাবরই ছিল।'

লক্ষণীয় যে অমর্ত্য সেন একালে এসেও বলছেন, 'আমাদের দেশে জাতিভেদের কাঠামোটা খুব প্রাচীন।' এই হিন্দু আইডেন্টিটি এই হিন্দুত্ব এটাই ভারত রাষ্ট্রের পরিচয়।

অমর্ত্য সেনের কথা আপাতত থাকুক। আমাদের প্রসঙ্গে ফিরি। এটাকেই বলেছি, মুসলিম লীগের নিজ কনস্টিটিউয়েন্সিতে পাকিস্তান কায়েমের পক্ষে তার একচেটিয়া ন্যায্যতা, সাফাই; প্রকারান্তরে ইনসাফ কায়েম করা। তবে (১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের আগে পর্যন্ত) এটাই মুসলিম লীগের গণমানুষ পর্যায়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হিসেবে টিকে থাকার কারণ। ফলে এই ফেনোমেনন মুসলিম লীগের জন্য যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তান আন্দোলনের দিক থেকে। পাকিস্তান কায়েম যে সঠিক ছিল এবং সর্বোপরি এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায়—পাকিস্তানের পূর্ব অংশে অন্তত পাকিস্তান কায়েম করা মানে জমিদারি উচ্ছেদ করে প্রজা কৃষকের ছিনিয়ে নেওয়া বা জমি ফেরত পাওয়া। এটাই বিগত ১৮১৮ সালে শুরু করা হাজি শরীয়ত উল্লাহর আন্দোলনের সবচেয়ে ইতিবাচক পরিণতি। সেই থেকে পূর্ব পাকিস্তানে 'জমি পাওয়া, ইসলাম আর পাকিস্তান' এ শব্দগুলো প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে যায়। সেই থেকে নতুন যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলো, এই রাষ্ট্রের নাগরিকের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও গঠনতন্ত্রতে 'ইসলাম' এক বিশেষ অর্থ তাৎপর্যে স্থায়ী আসন নিয়ে নেয়। ব্যাপারটা দাঁড়াল এমন যে, তারা ইসলামের নামে সমবেত হয়েছিল, জমিদার উচ্ছেদ করে জমি পাওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল, তারা পাকিস্তান কায়েম করেছিল। আসলে এ সবকিছুর ব্যবহারিক অর্থ হলো—জমিদারদের জমিগুলো যে ভূখণ্ডে, সেই ভূখণ্ডগুলোকে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' হিসেবে

https://nagorikpathagar.org

ঘোষণা করে নেওয়া আর কেবল জমিদারির দলিল, এই কাগজ হাতে জমিদারেরা কলকাতায় বসে বসে তা দেখতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে আইনিভাবে ১৯৫১ সালে জমিদার উচ্ছেদের আইন পাস হওয়ার বহু আগে থেকেই ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই প্রজাদের জমির ওপরে আর কার্যত জমিদারি কায়েম নেই—এমন হয়ে গিয়েছিল। ফলে পাকিস্তান কায়েমের সোজা অর্থ হলো—প্র্যাকটিক্যালি জমিদার উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া। এটাই ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সবচেয়ে তাৎপর্যময় ব্যবহারিক অর্থ।

যদিও বাইরের আবরণে এটা ইসলাম কায়েম বা পাকিস্তান কায়েম। জমিদারের প্রজারা যদি রাষ্ট্রক্ষমতাই পেয়ে যায়, তাহলে জমিদারি আর কোথায় থাকে! আর এই সবই হয়েছে একসঙ্গে, জমি পাওয়া, ইসলাম কায়েম, মুসলমান হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা আর পাকিস্তান কায়েম—সব একাকার ঘটনা।

সারকথায়, ১৯৪৭ সালে নব জন্ম নেওয়া নব-উত্থিত পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের সঙ্গে গঠনতন্ত্রতে 'ইসলাম' স্থায়ীভাবে জুড়ে যায়, জায়গা নিয়ে নেয়। তা হলে ইসলাম বা মুসলমান পরিচয় কী তার আগে ছিল না? অবশ্যই ছিল। তাহলে এই ইসলামের নতুন অর্থ কী? সে নতুন যা করেছে, তাহলো 'ইসলাম' এই ডাক নামে সমবেত ও উত্থিত হয়ে জমিদারি উচ্ছেদ করে ফেলেছে। তাই তার নতুন জনগোষ্ঠীগত পরিচয়ে ইসলাম একটা অঙ্গ, একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে।

আত্মপরিচয়, ইসলাম ও বাঙালি মুসলমানের রাজনীতি

অনেকে বাঁকা প্রশ্ন করতে পারেন, তার মানে ফর্মুলা কী এটাই যে, কাউকে জমিদারি উচ্ছেদ করতে হলে ইসলামের নামে সমবেত হতে হবে, মুসলমান পরিচয় নিতে হবে? না ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। প্রজা কখন কী নাম নিলে সহজেই নিজেরা সংগঠিত ও জমিদারি উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে, এর কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই, থাকে না। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ঘটনা যেভাবে ঘটেছিল, সে বাস্তবতা হলো—পূর্ববাংলা ইসলামের নামে সংগঠিত হয়েছিল। মুসলমান পরিচয়ে জমিদারি উচ্ছেদ সহজ মনে করেছিল তারা এবং তা করে দেখিয়েছিল। কিন্তু কেন? মুসলমান পরিচয়েই কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে 'কলকাতার' গঠনে। এর অ্যান্টি-থিসিসে। বিগত ১৭৯৩ সালের লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি ব্যবস্থার আইন হলো এর মূল কেন্দ্রবিন্দু ঘটনা। কৃষির উদ্বৃত্ত, হাট-বাজার-গঞ্জসহ অনেক শহর জায়গাতেও

https://nagorikpathagar.org

সঞ্চিত হয়, পুঞ্জীভূত হয়; অ্যাকুমুলেটেড বা পুঁজি নাম নেয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আকারে যেখানে সঞ্চিত হয়, সেটাকেই আমরা রাজধানী শহর বলি। সেকালে উদ্বৃত্ত সঞ্চিত করার উপায় হয়েছিল প্রজা শোষণে আনা কৃষি উদ্বৃত্ত ব্যাপকভাবে কলকাতায় আনা, যে কাজের মূল কর্তা ছিল জমিদার। ফলে ওই জমিদারের উত্থান আর কলকাতার গঠন একই কথা। কলকাতা মানে জমিদার। তা হলে ব্যাপারটা ছিল এই যে, মুসলমানদের বাইরে রেখে আপনি জমিদার যখন কলকাতায় বাংলার রেনেসাঁস করবেন বা করাবেন, পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, 'জমিদার-বাঙালি' প্রজেক্ট নেবেন, তখন কিন্তু আপনিই আসলে ঠিক করে দিয়েছেন—আপনাকে বধিবে কে! কার হাতে আপনি মরবেন! আপনার প্রজা 'মুসলমান' নামধারণ করে আপনাকে যেন বধ করে এই শর্ত তো জমিদারেরই বেঁধে দেওয়া, তাই নয় কি?

এই দিকটা বুঝলে আমরা বুঝব 'ইসলাম' পূর্ববঙ্গের মানুষের কী লাগে, কে হয়! কেন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম নিজ পরিচয়ের সঙ্গে লেপ্টে এই জনগোষ্ঠীর আর এক অন্যতম পরিচয় বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল। জনগোষ্ঠী, চলার পথে লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস, তাৎপর্যকে তার 'পরিচয় বৈশিষ্ট্য' হিসেবে সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে চলে। জনগোষ্ঠীগত আত্মগঠনের ফাইবার বা গঠনতন্ত্র হয়ে তা থেকে যায়।

আবার ওদিকে পূর্ববঙ্গের 'চাষাদের' এই প্রথম নিজের পুঁজি সঞ্চয়ের কাল শুরু করতে পেরেছিল এখান থেকেই। জমিদার উচ্ছেদ করে জমির উদ্বৃত্ত আর কলকাতায় নয়, ঢাকায় রাখার প্রচেষ্টা নিতে হয় তাকে। জমিদারের কাছারিতে বসার পাটি না পাওয়া সেই মুসলমান প্রজা, সেই 'চাষার' দিন ফেরা শুরু হয় এখান থেকে; যদিও আরও একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ পার হতে হয়েছিল তাকে।

পুরো ষাটের দশককে বিশেষ করে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ছয় দফা দেওয়ার পর থেকে পরিস্থিতিকে আমরা স্বায়ত্তশাসনের বা বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন বলি। আর এক অর্থে এটাই 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর রাজনৈতিক উত্থানের যুগ। এই দশক ছিল পাকিস্তানের বা পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য করছে, এই বিষয়টাকে মুখ্য ইস্যু করে সচেতনতা তৈরির কাল। এতে স্বভাবতই প্রতীকীভাবে বললে বলা যায়, পাকিস্তান শব্দটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর কাছে তখন থেকে আর আকর্ষণীয় উজ্জ্বল রং নয়। ক্রমে এর উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। এমন আর থাকেনি শুধু তা-ই নয়; বরং ১৯৪৭ সালের পরে এই প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রমে বিবর্ণ হতে শুরু করেছিল।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু লক্ষণীয়, ইসলাম বা নিজের মুসলমান পরিচয় বোধের গর্ব, যাকে ওপরে 'নিজের জনগোষ্ঠীগত আত্মগঠনের ফাইবার বা গঠনতন্তু হয়ে' থেকেছে বলেছি, তাতে কোনো দাগ পড়েনি, তা ম্লান হয়নি। এরই প্রতিফলন বলে মনে করতে পারি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে। আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিল, তারা নির্বাচিত হলে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না।

তবে এমন প্রতিশ্রুতির পথে কেন আওয়ামী লীগ যেচে গিয়েছিল, তা বুঝতে আমাদের অন্য একটি বিষয়ের দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

পাকিস্তানের মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে পাকিস্তান কায়েম ছিল এক বিরাট অর্জন। যদিও তখনও পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী অমুসলমান জনগোষ্ঠী আর ওদিকে ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দেশভাগ বা পাকিস্তান গঠন প্রসঙ্গে অবস্থান। আর সে নিরিখে তাদের ইতিহাসের বয়ান হলো—'দেশভাগ একটি খুবই নেতিবাচক ঘটনা, একটি খুবই খারাপ কাজ'; এই হলো ওপারের মূল্যায়ন। কিন্তু দুই বাংলার লিখিত ইতিহাসে আধিপত্য পশ্চিমবঙ্গের বেশি; যদিও এই আধিপত্য ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেশভাগ খারাপ এই বয়ানটা কমন বলে চালানোর চেষ্টা আছে। যেমন : জয়া চ্যাটার্জি দেশভাগ হওয়ার ব্যাপারটা খারাপ হয়েছে—এই অনুমানকে কমন, মানে দুই বাংলার মূল্যায়ন একই, এটা ধরে নিয়ে আর সে অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে অবলীলায় দেশভাগ নিয়ে *বাংলা ভাগ* বইটি লিখে গেছেন। তবে দেশভাগ ভালো না মন্দ হয়েছে, সে তর্কে না ঢুকেও সে সময়ের সত্য বা মাঠের ফ্যাক্টস হিসেবে বলা যায়, পুরো পাকিস্তানের মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে দেশভাগ ছিল এক বিশাল ইতিবাচক পদক্ষেপ, এক বিরাট অর্জন। এই সত্যতাকে আমলে রাখলে তবেই কবি সুফিয়া কামাল বা তাঁর মতো অনেকেরই পাকিস্তান অর্জনকে গ্লোরিফাই করে লেখা কবিতা বা প্রবন্ধ যা আমরা দেখতে পাই—সেগুলোর অর্থ, তাৎপর্য বুঝব। আবার একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে—এসব মূল্যায়ন, বোধ অনুভূতি ১৯৭১ সালের আগের, যা স্বভাবতই ১৯৭১ সালের পরে বদলে যায়। ইতিহাসের সততার দিক থেকে তাই ১৯৭১ সালের পরের বোধ ও মূল্যায়নের আলোকে ১৯৭১ সালের আগের মূল্যায়ন, বোধ ও অনুভূতিকে সাজানো বা লুকিয়ে ফেলা অপ্রয়োজনীয়। কেবল পরিষ্কার থাকলেই হলো যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদেরই আগের অনেক মূল্যায়ন আমরাই বদল করেছি।

https://nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ধর্মনিরপেক্ষতার আগমন

তাহলে 'সেক্যুলারিজম' ৭১-এর যুদ্ধের সময় কী করে ঢুকল বা হাজির হলো? সেক্যুলারিজম কেমন করে এলো, এর একটা প্রচলিত ব্যাখ্যার দিকে যাই। ১৯৪৭-এর দেশভাগ ইস্যুতে পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার পর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো—পাকিস্তান, এরা ভারতের শত্রু। জানি দুশমন। কারণ, এরা নেহেরুর কংগ্রেস বা হিন্দু জনগোষ্ঠীকে অখণ্ড ভারতভূমি গড়তে দেয়নি। আলাদা মুসলমান পরিচয়ে ভেঙে নিয়ে চলে গেছে।

ফলে সেই থেকে কল্পনাতেও ভারতীয় নেতাদের কখনো এটা মনে না আসারই কথা যে, (কল্পনা করা যাক) পাকিস্তান যদি কখনো ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক রাষ্ট্র হতে চায়, তাহলে ভারত তখন তাতে কী শর্ত রাখবে, কী শর্ত দেওয়া খুবই জরুরি মনে করবে? কারণ, দেশভাগের পরে যে শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তান এটাই আজীবনই থাকবে, ভিন্ন কিছু হতে পারে সেটা স্বপ্ন-কল্পনাতে তো এতদিন আসেনি, ছিল না! তাই কী শর্ত দেবে—এটা নিয়ে কোনো হোমওয়ার্কও করা হয়নি।

কিন্তু ১৯৭১ সালে এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়—যা সেই কল্পনারও অতীত। আমরা সাড়ে সাত কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক কোটিই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়; পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে কেবল খাওয়া-পরা আশ্রয় জোগাড় করে দেওয়া নয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও ভারতের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের দিক থেকে দেখলে শত্রু পাকিস্তানের এক অংশকে সহায়তা করা; যেটা ১৯৪৭ সালের পর থেকে সে পর্যন্ত স্বপ্নেও অকল্পনীয় ছিল।

খেয়াল করতে হবে, ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের বিরোধিতা বা তাদের শত্রুজ্ঞান করা হয়েছিল যে কারণে, সেই একই জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশের হয়ে এবার একই ভারতের যুদ্ধ লড়তে যাওয়ার স্বার্থ তৈরি হয়েছে। যদিও তা এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই একটা জিনিস একই আছে: ১৯৪৭ সালে যারা দেশভাগ করে আলাদা রাষ্ট্র করেছিল, সেই জনগোষ্ঠী ১৯৭১ সালের বাস্তবতা নতুন হলেও তারা কিন্তু সেই একই মুসলমান। তা হলে স্বভাবতই আমরা অনুমান করতে পারি—ভারতীয় নেতৃত্বের (ইন্দিরা গান্ধীর) মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, মুসলমান পরিচয় প্রধান করে পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র করে ফেলা যদি সে সময়ে ভারতের অপছন্দের থেকে, থাকে তবে ১৯৭১ সালে সেই মুসলমান পরিচয়ের জনগোষ্ঠীকে আবার তাদের আলাদা রাষ্ট্র গড়ে দিতে সেই ভারতই সহায়তা করে কেমন করে? এটা তো সবিরোধিতা!

https://nagorikpathagar.org

খুব সম্ভবত এই স্ববিরোধিতা মেটাতে তিনি 'সেক্যুলারিজম'-এর কথা এনেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা তিনি এনেছিলেন, এমন ধারণা করবার পেছনের কারণ হলো–তখন পর্যন্ত ভারতের কনস্টিটিউশনে সেক্যুলারিজম শব্দ বা ধারণা নেই। ১৯৭৬ সালের ভারতীয় কনস্টিটিউশনে ৪৪তম সংশোধনী এনে সমাজতন্ত্র, সেক্যুলারিজম ও জাতীয় ইন্টিগ্রিটি এই তিন বৈশিষ্ট্যের কথা ঢোকানো হয়েছিল। এতে কনস্টিটিউশনের প্রিএম্বল বা ভূমিকায় 'Sovereign Democratic Republic'– এই শব্দগুলোর বদলে 'Sovereign Socialist Secular Democratic Republic' শব্দগুলো বসানো হয়। অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে ভারতের কনস্টিটিউশন ঘোষণার সময় সেখানে সেক্যুলার শব্দ ও ধারণাটা ছিল না। তাহলে ফ্যাক্টস হলো, ১৯৭৬ সালে ভারতের কনস্টিটিউশনের ৪২তম সংশোধনী আনার পর থেকে ওর কনস্টিটিউশনে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষতা বৈশিষ্ট্যের কথা অন্তর্ভুক্ত হয়।[১২৬]

ফলে এখান থেকে আমাদের ধারণা প্রবল হয় যে, আমাদের রাষ্ট্রগঠনের সময় যাতে মুসলমান পরিচয়ের বিষয়টা না আসতে পারে, এর রক্ষাকবচ হিসেবে তার মাথায় সেক্যুলারিজম শব্দটা এসেছিল। এতে সুবিধা হলো–তিনিও বলতে পারেন, কোনো মুসলমান রাষ্ট্র বানাতে তিনি সহায়তা করেননি।

এই রেফারেন্সের সুযোগে আর একটা কথা বলে নেওয়া যাক। লেখক যতীন সরকারসহ অনেকেরই ধারণা, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। জন্ম থেকেই মানে ১৯৪৯ সালের কনস্টিটিউশনে গঠিত হওয়ার পর থেকেই তাতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ আছে বলে এরা বিশ্বাস করেন বা দাবি করেছেন। যেমন : যতীন সরকার লিখেছেন–

'ভারত রাষ্ট্রের স্থপতিরা অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থারই প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও তাদের সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা পদে পদেই বাধা পেয়েছে।'[১২৭] অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন ভারতীয় কনস্টিটিউশনে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, কিন্তু তা "প্রতিষ্ঠা পদে পদেই বাধা" পেয়ে আছে। কিন্তু না, স্যরি যতীন সরকার। "সংবিধানেও তাদের সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন"

---

১২৬. http://indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend42.htm এই সাইট লিংকে গিয়ে এই বক্তব্যের রেফারেন্স পরখ করা যেতে পারে।

১২৭. পৃষ্ঠা : ১১৮, 'পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন'

https://nagorikpathagar.org

ঘটেনি অন্তত ১৯৭৬ সালের আগে। যদিও যতীন সরকারসহ অনেকেই "যা" খুঁজছেন, দেখতে চাইছেন, তা কনস্টিটিউশনে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকা না থাকা দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। কারণ, কনস্টিটিউশনে ধর্মনিরপেক্ষতা লেখা না থাকলেও তা পাওয়া যেতে পারে। আবার যদি ইসলামবিদ্বেষী হয়ে কনস্টিটিউশনে ধর্মনিরপেক্ষতা লিখে রেখে থাকেন, তবে "তা-ও" পাওয়া যাবে না।'

এসব আলোচনা থেকে এখন এটা পরিষ্কার যে, পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখায় 'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভারতের স্বীকৃতি চেয়ে ভারত সরকারকে লেখা ২৩ নভেম্বরের প্রদত্ত যে চিঠির' কথা আমরা জানতে পারি, যেখানে প্রথম আমরা বাংলাদেশ সরকারের কোনো 'রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা' আছে বলে জানতে পারি। আর তা হলো–'Principles of democracy, secularism, socialism and a non-aligned foreign policy'। এসবই তা হলে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের প্রবাসী সরকারের আগাম আলোচনা ও একমতের ফসল। অথবা বলা যায়, আমাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগাম পূর্বশর্ত।

এর সোজা অর্থ ইন্দিরা তাজউদ্দীনের স্বাধীনতার ঘোষণায় সাম্য, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার; এই তিন নীতিকে যথেষ্ট রক্ষাকবচ মনে করতে পারেননি। আধুনিক রিপাবলিক ধারণায় সাম্য খুবই গভীর, অর্থবোধক। যেমন: ধর্মীয়সহ মানুষে মানুষে যেকোনো বিভক্তিচিহ্ন পরিচয়ের ঊর্ধ্বে সবাই নাগরিক, আর এই নাগরিক মাত্রই সকলে বৈষম্যহীন সমান–এই অর্থে সাম্য। এ ছাড়াও সেইসঙ্গে সমান মানবিক মর্যাদা আর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা গেলে সে রাষ্ট্র এমনিতেই সেক্যুলার বৈশিষ্ট্যের হয়—এই অর্থে সে সব নাগরিকের প্রতি বৈষম্যহীন ও সমান দৃষ্টিতে দেখবে। ফলে আর আলাদা করে সেক্যুলার বলা অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, সন্দেহজনকও। যে বলে প্রয়োজন হয়, সে এই তিন নীতির মর্ম বুঝতে অক্ষম অথবা এই তিন নীতি সে বাস্তবায়ন করতে চায় না। কৌশলে রাজনৈতিক অসাম্যই চায়। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে, অপ্রয়োজনীয় 'সেক্যুলার' শব্দ সে আনতে চায় নিজের ইসলামবিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য। আর এ কারণেই তিন নীতি থাকা সত্ত্বেও ভারতের শর্ত হিসেবে তথাকথিত চার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা কখনো মৌলিক কাঠামোর কথা বলে দলীয় চার নীতি আকারে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর সেক্যুলারিজম সেই থেকে হাজির হয়েছিল। বিষয়গুলো মৌখিক কথাবার্তায় এভাবে সেটেল হয়েছিল। সম্ভবত বাংলাদেশ তখনও পরিপূর্ণ রাষ্ট্র নয় বলে কোনো দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করার দিকে যায়নি। তবে কেবল দেশ স্বাধীনের পরে কনস্টিটিউশন লেখার সময় কোনো পূর্বাপর ভূমিকা ছাড়া ওই চার নীতি আনা হয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

এর অর্থ তা হলে দাঁড়ায় ১৯৪৯ সালের ভারতের কনস্টিটিউশনে বলা হয় ভারত একটা রিপাবলিক রাষ্ট্র, হিন্দিতে বলা হয় সাধারণতন্ত্র। নিজেদের বেলায় অন্তত তখন 'রিপাবলিক হলেই চলে'–সেটাই যথেষ্ট মনে করেছিলেন তারা। ফলে সেক্যুলারিজম বলে কোনো অপ্রয়োজনীয় ও মতলবের কথা তারা সেখানে রাখেননি। তার মানে হিন্দু-মুসলমানসহ সবার বেলায় সকলকে নিয়ে রাষ্ট্র করতে হলে কেবল রিপাবলিক রাষ্ট্র বা সাধারণতন্ত্র বললেই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ভারতের জন্মের বেলায়। তাই যদি হয়, তা হলে একই ফর্মুলায় বাংলাদেশকেও প্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্র বা সাধারণতন্ত্র বললেই যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি কেন? ইন্দিরা গান্ধী তা মনে করেননি। তিনি বাড়তি সেক্যুলার শব্দ লাগানোর সুপারিশ রেখেছিলেন।

তাহলে ব্যাপারটি কি এ রকম যে, ভারত আসলে হিন্দুত্বের রাষ্ট্র বলে কেবল রিপাবলিক রাষ্ট্র বা সাধারণতন্ত্র বললেই যথেষ্ট বিবেচিত হবে? কিন্তু বাংলাদেশ মুসলমানপ্রধান বলে একে শুদ্ধ করে নিতে সেক্যুলার সাইনবোর্ড টাঙাতে হবে? ভারতের মুসলমানভীতি কাটাতে এটা করতে হবে। আর তার মানে ১৯৭৬ সালে এসে সেক্যুলারিজমের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর আসক্তি থেকে মনে হয়, এর পর থেকে তার চোখে এটাই রিপাবলিক রাষ্ট্রের স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়ায়। তবে অবশ্য *এটি* 'ইন্দিরা গান্ধী স্ট্যান্ডার্ড'। আর অবশ্যই এটা 'আইডেনটিটির রাজনীতি'।

এসব আলোচনা থেকে এখন এটা পরিষ্কার যে 'জাতিরাষ্ট্র', 'জাতীয়তাবাদ', 'আইডেনটিটি' এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক পরিসর এবং রাষ্ট্র ধারণার মৌলিক দিক বিষয়ে বিরাট রকমের অস্পষ্টতা তখনও ছিল, এখনও আছে; যদিও এর অনেকটাই একালে কেটেছে। সেসব স্পষ্ট ধারণাকে সামনে চর্চায় নিয়ে আসলে অন্তত 'আইডেনটিটি রাজনীতি' করতে না চাইলে সেখান থেকে বাইরে আসা সম্ভব হবে। আর আগেই বলেছি, আলাদা করে সেক্যুলার বলা অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয়; সন্দেহজনকও বটে। এটি খুব সম্ভব ইসলামবিদ্বেষ থেকে আসছে। সে হয় তিন নীতির মর্ম বুঝতে অক্ষম অথবা এই তিন নীতি সে বাস্তবায়ন করতে চায় না। কৌশলে রাজনৈতিক অসাম্যই চায়।

পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের এক বই *'বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল'*-এর রেফারেন্স আছে। ওখানে তিনি বলেছেন–

> '১৯৭২ সালের সংবিধানে ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রেক্ষাপটে ছিল

https://nagorikpathagar.org

> পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকের ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঐতিহ্য। আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে প্রচার চালিয়ে আসছিল।'

এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ দাবি করে যা বলছেন, তা কোনো রেফারেন্স ছাড়া এক জোর-জবরদস্তিমূলক দাবি। এখানে দ্বিতীয় বাক্য পুরোটাই ভিত্তিহীন। কারণ, 'আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়'—এর কোনো রেফারেন্স তিনি দেননি। বিশেষত আওয়ামী লীগ দলের কোনো রাজনৈতিক দলিলে এটা আছে—এমন কোনো রেফারেন্স তিনি দেননি। ১৯৭২ সালের পরের আওয়ামী লীগের দলিলে এ কথাগুলো পাওয়া যায় বলে তা ১৯৭২ সালের আগেও ছিল, এমন অনুমান করে নিয়ে বলা তাঁর কথার গ্রহণযোগ্যতা নেই।

শেষ কথা

যে কথা বলছিলাম, ষাটের দশকে বিশেষ করে ছেষট্টি সালে ছয় দফা দেওয়ার পর থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পূর্ববাংলা একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মানে পাকিস্তান ভেঙে বের হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। এর প্রতিক্রিয়ায় যে পালটা বয়ান তৈরি হয়েছিল, সেদিকে মনোযোগ দিলেও অনেক কিছু পরিষ্কার হবে। দেশভাগ ও পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর দুই পাকিস্তানের মধ্যে বহু নতুন বিরোধের ইস্যু হাজির হওয়া সত্ত্বেও যেটা কমন গ্রাউন্ড ছিল তা হলো—পাকিস্তান হাসিল করার ক্ষেত্রে ইসলাম একটা কমন গ্রাউন্ড এবং ইসলামের এই ভূমিকা নিয়ে উভয় পাকিস্তানে কোনো মতভেদ নেই। তাই ছয় দফার বিরোধিতা যারা করতে আসে, তাদের সে বিরোধিতা শুরু হয়—যারা মূলত ইসলামপন্থি দল এবং খোদ পাকিস্তান রাষ্ট্র এদের তরফ থেকে। এরাই বিরোধী বয়ানে অভিযোগ সাজিয়েছিল এভাবে যে, আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙা বা ইসলামের ক্ষতি করার পক্ষে কাজ করছেন। সারা পাকিস্তানে এর আগে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ খুবই ঘৃণিত ও সেনসিটিভ বলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলা হতো যে, এটা যারা করে তারা ভারতের দালাল। তাই ছয় দফার বিরোধীরা তাদের অভিযোগটাকে সেনসিটাইজ করতে এভাবে সাজিয়ে নিয়েছিল। এতে স্বভাবতই আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফা সমর্থকদেরকে সাবধানতা

https://nagorikpathagar.org

অবলম্বন করতে হয়েছিল। তাই তারা স্পষ্ট করতে শুরু করেছিল যে, ছয় দফা দাবির সঙ্গে ইসলাম বিরোধিতা করার কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে তারা মূলত পাকিস্তানি শাসকদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের দাবি এই বৈষম্য দূর করতে হবে। আর তা কোনো মতেই পাকিস্তান ভাঙা বা ইসলামের বিরুদ্ধের কোনো কাজ বা তৎপরতা নয়।

এ থেকে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যেখানে ছয় দফার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তোলা হয়েছিল ইসলাম বিরোধিতা বা পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা; সেখানে এটা পরিষ্কার যে, ছয় দফা আন্দোলনকে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা বা স্বয়ং শেখ মুজিব নিজে যেচে এটা 'সেক্যুলারিজম' কায়েমের আন্দোলন দাবি করবেন—এটা ঘটতেই পারে না। কারণ, এটা আত্মঘাতী হতো। শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হতো; বরং ছয় দফার আন্দোলনের সঙ্গে যে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই, সেটাই সব সময় দাবি করা হয়েছে। সেই সব প্রোপাগান্ডা মোকাবিলা করতেই পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল যে, কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন করার আন্দোলন এটা নয়।

তাহলে সারমর্মে বললে রাজনীতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু না বলার একটা ভারী সেন্টিমেন্ট তখনও বর্তমান ছিল। আর ঠিক সে কারণে প্রবাসী সরকারের জনগণকে অ্যাড্রেস করার বেস্ট কমিউনিকেটিভ উপায় হলো, ইসলামি আদব লেহাজ পরিভাষা ব্যবহার করে কথা বলা। স্বভাবতই এতে এক কাজে অনেক কাজ হবে। এটাই পিনাকী ভট্টাচার্যের সংগৃহীত তথ্যে আমরা দেখছি যে, এতে জনগণকে আর আলাদা করে বলার দরকার নেই যে, ওই প্রবাসী সরকার ইসলামবিরোধী নয়। এ ছাড়া আগেই বলেছি, দেশভাগ মূলত জমিদারি উচ্ছেদ বা প্রজার জমি পাওয়ার আন্দোলন, যেখানে ফলাফলে 'মুসলমান' তার পরিচয় বৈশিষ্ট্য 'জনগোষ্ঠীগত আত্ম-গঠনের ফাইবার বা গঠনতন্তু হয়ে আবির্ভূত হয়ে যায়। এই পরিচয় বৈশিষ্ট্য প্রবাসী সরকারও আমল করেছে, মনে রেখেছে।

অতএব, সেক্যুলারিজম পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কর্নারের রাজনৈতিক দাবি হওয়ার সুযোগই ছিল না।

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

০১. আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯০

০২. আমার বন্ধু রাশেদ (চলচ্চিত্র), মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত।

০৩. একাত্তরের চিঠি, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯

০৪. দ্য পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, জানুয়ারি ৪, ১৯৭১

০৫. এম. গোলাম মোস্তফা ভূইয়া, 'মওলানা ভাসানী ও কাগমারী সম্মেলন', দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

০৬. কামরুদ্দীন আহমদ, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২

০৭. কৌশিক আহমেদ, 'এই গণজাগরণ ছাড়া এই শিল্পিত প্রতিবাদ সম্ভবত সৃষ্টি হতো না', Eidesh.com, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৩

০৮. খন্দকার আবুল খায়ের, ১৯৭১-এ কি ঘটেছিল রাজাকার কারা ছিল, তৌহিদ প্রকাশনী (৩য় সংস্করণ), যশোর, ১৯৯২

০৯. গোলাম আযম, পলাশী থেকে বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ও প্রকাশক অজ্ঞাত।

১০. জয় বাংলা পত্রিকা সংকলন, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

১১. জয়বাংলা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র, মুজিব নগর, ১৯৭১

১২. তানজিল আমির, 'মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু মাওলানা সাইয়্যেদ আসআদ মাদানি', যুগান্তর, ২৫ মার্চ, ২০১৬, ঢাকা।

১৩. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১), একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০০৭

১৪. দৈনিক সংগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, ঢাকা।

১৫. নুহ-উল-আলম লেনিন (সম্পাদিত), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫

১৬. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮

১৭. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭০

১৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ১ম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

১৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

২০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

২১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ৪র্থ খণ্ড,, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

২২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, পঞ্চম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

২৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, একাদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

https://nagorikpathagar.org

২৪. মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, জগলুল আলম অনূদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬
২৫. মীম মিজান, 'মওলানা ভাসানী ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান', দৈনিক সংগ্রাম, শুক্রবার ১৭ মার্চ, ২০১৭
২৬. মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
২৭. মুফতি তাকী উসমানী, জাহানে দিদা, ইদারতুল মারুফ, করাচি, (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)
২৮. মুশতাক আহমেদ, শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানি রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১।
২৯. মুহাম্মদ নূরুল কাদির, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, ৩য় সংস্করণ, সিটি পাবলিশিং হাউস লি., ঢাকা, ১৯৯৭
৩০. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, 'কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা', প্রথম আলো, ২৬ মার্চ, ২০১২
৩১. শাকের হোসাইন শিবলি (সম্পাদিত), বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ভূমিকা, আলেম মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম, ঢাকা, ২০১৩
৩২. শাকের হোসাইন শিবলি, একাত্তরের চেপে রাখা ইতিহাস : আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, আল-এছহাক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪
৩৩. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২
৩৪. শেখ মুজিবুর রহমান, মুজিবুরের রচনা সংগ্রহ, বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৬২
৩৫. সরদার ফজলুল করিম (অনূদিত), রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০
৩৬. সাইফুল ইসলাম, স্বাধীনতা ভাসানী ভারত, বস্তু প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩
৩৭. সৈয়দ মবনু, দ্রাবিড় বাংলার রাজনীতি, প্রকাশনা নগর, সাহিত্য ও প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৯
৩৮. সৈয়দ শামসুল হক, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, মঞ্চনাটক
৩৯. হায়দার আকবর খান রনো, শতাব্দী পেরিয়ে, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫
৪০. মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পাচ্ছেন দেওবন্দি আলেম, চৌধুরী আকবর হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, banglamail24.com, ৩০ সেপ্টেম্বর, সোমবার, ২০১৩
৪০. 'Freedom in the Air', The Daily Star Archive
৪১. RECORDS, USAID fund was diverted to pay razakars', Dhaka Tribune, January 24, 2017
৪২. https ://news.wikinut.com/img/2vuxg7c5_b_chm8y/Razakars-surrendering
৪৩. Sarmila Bose, 'Myth-busting the Bangladesh War of 1971', aljazeera.com, 9 MAY 2011
৪৪. Shaukat Hassan, India-Bangladesh Political Relations during the Awami League Government, 1972-75, Unpublished PhD Thesis, Australian National University, April 1987.
৪৫. একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৯
৪৬. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্র নভেম্বর; কর্নেল শাফায়াত জামিল (অব.), সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ, ২০১৬
৪৭. বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থাকারের প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ

১. ডিসকোর্স অন মেথড, রেনে দেকার্ত (অনুবাদ)
২. বালাই ষাট (স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্পর্কিত রচনা)
৩. মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ : সাফল্যের তত্ত্ব তালাশ (ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্যে পেশাগত বই)
৪. চীন কার্টুম (ছোটদের জন্যে চীন ভ্রমণকাহিনি)
৫. ওয়েদার মেকার (থ্রিলার সায়েন্স ফিকশন)
৬. ধর্ম ও নাস্তিকতা : বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব
৭. সোনার বাঙলার রুপালী কথা (কিশোরদের জন্য রচিত বাঙলার ইতিহাস)
৮. রবীন্দ্রনাথ : অন্য আলোয় (রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যা)
৯. রবি বাবুর ডাক্তারি
১০. মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনীতি (প্রবন্ধ সংকলন)
১১. নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু স্বল্প জানা বিষয় নিয়ে রচনা)
১২. ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ
১৩. মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'৭১
১৪. মন ভ্রমরের কাজল পাখায় (পশ্চিমা চিত্রকলা সমঝদারির হাতেখড়ি)
১৫. এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম : চিন্তার অভিযাত্রা
১৬. ইতিহাসের ধুলোকালি
১৭. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ (প্রথম খণ্ড)

https://nagorikpathagar.org

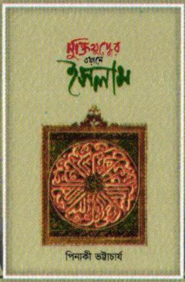

মুক্তিযুদ্ধের নির্মাণ ও মুক্তিযুদ্ধকালে ইসলাম যে ডিসকোর্স হিসেবে হাজির ছিল, তার অনুপুঙ্খ অনুসন্ধানের একটা প্রয়াস *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম*। ইতিহাসের হাত ধরে ঐতিহ্য নির্মিত হয়; ইতিহাসের পাঠ তাই নির্মোহ হওয়া সময়ের দাবি। চিন্তাশীল লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য মহান মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের যাপিত ধর্ম ইসলামের অবস্থান ও বয়ানকে উপস্থাপন করতে তথ্য ও প্রমাণের সাগর পাড়ি দিয়েছেন। অবগুণ্ঠন উন্মোচনের এক ঐতিহাসিক সফরে আপনাকে স্বাগত।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
ISBN: 978-984-92959-7-6

https://nagorikpathagar.org